পার্বত্য শান্তিচুক্তি

একটি আগা-গোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

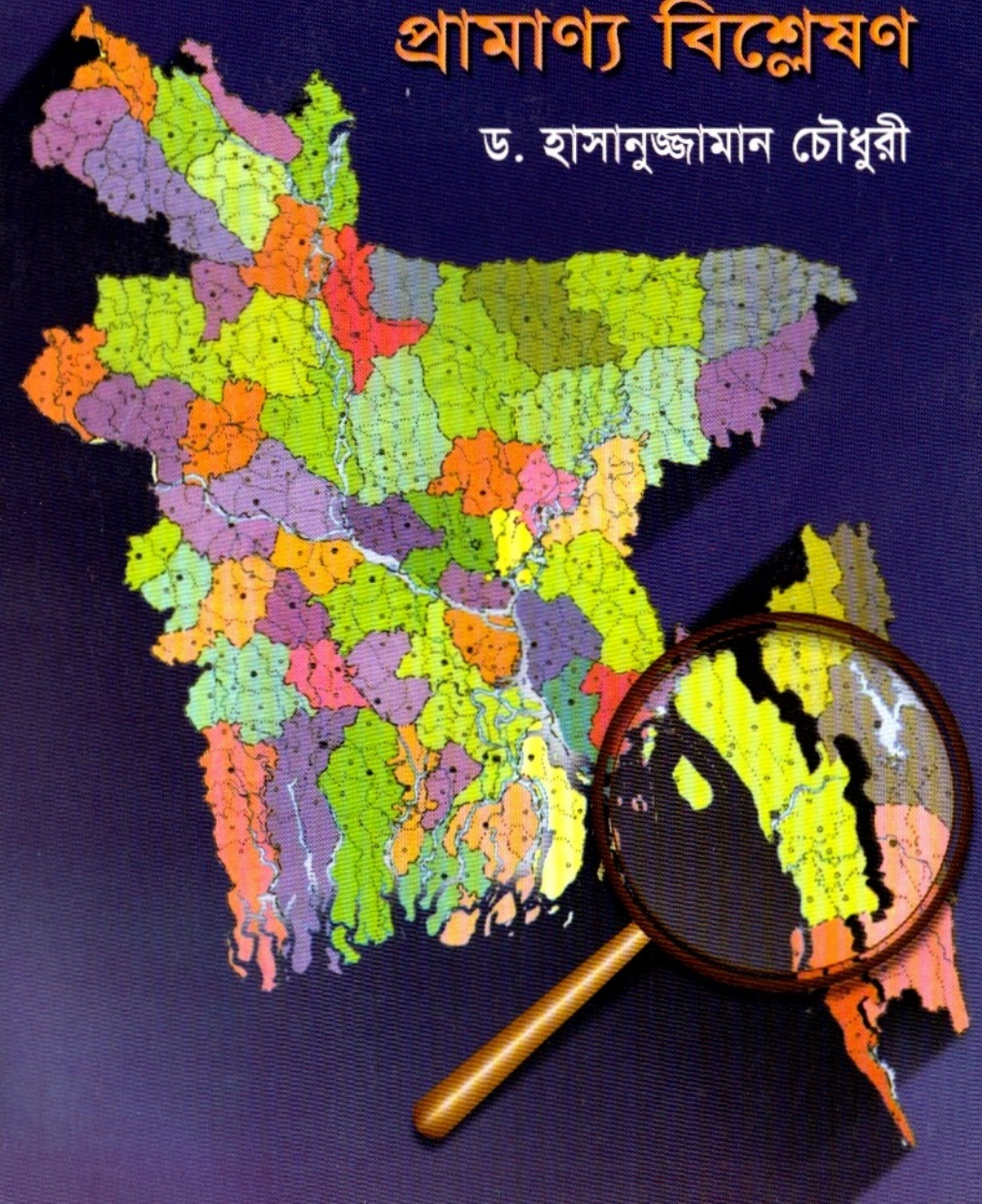

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

একটি আগা-গোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

www.pathagar.com

পার্বত চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

একটি আগা-গোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ ঃ ০১ জানুয়ারী ১৯৯৮

প্রকাশক ঃ বাংলাদেশ সেন্টার ফর সোশিও-পলিটিক্যাল রিসার্চ , ঢাকা

কপিরাইট ঃ লেখক

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

গ্রাফিকস ঃ ডট প্লাস

মুদ্রণ ঃ চৌকস, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০

লেখকের ব্যক্তিগত লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের সমগ্র বা এর কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ, কোনো লেখায়-রচনায় অন্তর্ভুক্তি, অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ নিষিদ্ধ। অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেবল তথ্য উপস্থাপনায় ও গবেষণায় যথাযথ উদ্ধৃতিসহ এর ব্যবহার করা যাবে।

মূল্য ঃ ১০০/- (একশত) টাকা মাত্র

CHITTAGONG HILL TRACTS PEACE TREATY : AN AUTHENTIC ANALYSIS FROM BEGINNING TO END by Dr. Hasanuzzaman Choudhury. First Published : 01 January 1998. Published by : Bangladesh Centre for Socio-Political Research (BCSPR), Dhaka. Price : Taka One Hundred Only.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যারা ঈমান রাখে
আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উপর,
যারা বিশ্বাস করে
অন্যায়ের প্রতিরোধ করা দ্বীনি দায়িত্ব,
তাদেরকে —

www.pathagar.com

লেখকের কথা

স্বাধীন বাংলাদেশের এ যাবৎকার জীবনে সবচেয়ে বিতর্কিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলো। বারো কোটি মানুষের এই সমাজ। বিপুল অধিকাংশই নিরক্ষর। যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষিত তারা বুঝে-না বুঝে পক্ষ নিয়ে নিচ্ছে। যারা চুক্তির পক্ষে সাফাই গাইছে, তাদের কোনো দরকার নেই এটি গভীরভাবে পড়ার, অনুধাবনের। তারা সংকীর্ণ স্বার্থে, অন্ধ স্তাবকতায় ডুবে গিয়ে শোনা কথা, শেখানো বুলি দিয়ে স্রেফ গণ্ডমূর্খের মতো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানপাপী অথচ লাভের লোভে প্ররোচিত নানা ক্ষেত্রের কিছুসংখ্যক সুবিধাবাদী বুদ্ধি ব্যবসায়ী এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। রেডিও-টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা এদের দখলে। সরকার এদের পেছনে সকল সমর্থন নিয়ে। নগদ বিনিময় এক্ষেত্রে আসল প্রেরণা। সততা, নিষ্ঠা, গভীর পাঠ, গবেষণা, অনুসন্ধানের এক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। সেজন্যে ক্ষমতান্ধ ও রাজনৈতিক অন্ধরা এদেশে আজ বেশী চোখে দেখে। আর এর বিপরীতে যারা, তারাও, খুব দুর্নীরিক্ষ্য সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদে, প্রায় সবাই শুনে-মুসলমান। এরাও গভীরে যেতে, মেহনত করতে, বিপদের ঝুঁকি নিতে উৎসাহী নয়। কাজ চালানোই এদের মুখ্য বিবেচনা। তাই দেখা গেলো, বারো কোটি মানুষের সমাজ অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে; অন্ধকারেই চোখে দেখছে। আসলে বাস্তবে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

উপরে বর্ণিত পরিস্থিতি-সৃষ্ট যন্ত্রণা বোধ; দেশের অংশবিশেষের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া ও এর দূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ায় দেশ ডুবে যাওয়ার আশংকায় সচেতন হয়ে; জন্মভূমির প্রতি মমতায় তাড়িত হয়ে; এবং মৌলভাবে হক্কুল ইবাদ পালনের গরজে বর্তমান গবেষণা সমাধা করেছেন লেখক।

এই গবেষণা কর্মটি মানুষকে যদি আলো দেয়; যদি এযাবৎ একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গভীর গবেষণা হিসাবে পথ দেখায়; যদি মানুষ বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী বহি:শক্তির সঙ্গে দেশাভ্যন্তরের ক্ষমতা কাঠামোর স্বার্থযোগ বুঝতে পেরে এবং পার্বত্যচুক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করে প্রতিরোধে এগিয়ে আসে, তবেই বর্তমান গবেষক-লেখকের পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই গবেষণা কর্মটি এখন দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংগ্রাম ও সাপ্তাহিক বিক্রম পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে (ডিসেম্বর ১৯৯৭-জানুয়ারী ১৯৯৮)। পাঠকের বিশাল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রতিদিন। পাঠকের অনুরোধ, স্থায়ী দলিল রাখা, কার্যকর উপলব্ধি সৃষ্টি, করণীয় নির্দেশ ও অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই গবেষণা কর্মটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো।

বাধ্য হয়ে বলছি, চুক্তির বিরোধী পক্ষে অবস্থান-প্রদর্শনকারী কিছু সুযোগ-সন্ধানী বুদ্ধি ব্যবসায়ী নিজেরা একেবারেই পরিশ্রম না করে কেবল মুফ্‌তে নির্দিষ্ট মঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এবং সংকীর্ণ ব্যক্তিক ভবিষ্যৎ রচনার তাগিদে বর্তমান গবেষণা কর্মটির বিভিন্ন অংশ পত্রিকা থেকে দেখে নিয়ে আত্মসাৎ করে সেমিনার করছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন। এটি নিন্দনীয়। এই গবেষণা থেকে যে কেউ শিক্ষা নিতে পারে। কিন্তু কোথাও আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা বা সেমিনার প্রবন্ধে এর রসদ বা বাক্যাবলী ব্যবহার করলে যথাযথ উদ্ধৃতি দেওয়া দরকার। নচেৎ অসততা হবে।

আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন। আল্লাহ্ বাংলাদেশকে ও আমাদের সবাইকে হিফাজত করুন।

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১ জানুয়ারী ১৯৯৮

www.pathagar.com

পার্বত্য শান্তিচুক্তি
একটি আগা-গোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ

ভূমিকা

জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকার যে পার্বত্য শান্তিচুক্তি করেছে, সেটি বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী, মৌলিক অধিকার ও গণবিরোধী, দেশ ও জাতি বিরোধী এবং সর্বোপরি ন্যায়বিচার ও শান্তি বিরোধী বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এই চুক্তি যে কেবল সংকীর্ণ ক্ষমতার স্বার্থে, প্রতিবেশী আগ্রাসী শক্তির স্বার্থে করা হয়েছে, তা-ই নয়। এটি করা হয়েছে নিদারুণ অশিক্ষা, পর্বত প্রমাণ অজ্ঞতা, নোংরা জিদ, মরীচিকাসম সাফল্যের লিপ্সা ইত্যাদির সর্বগ্রাসী প্রাবল্যের কারণেও। যারা চুক্তি করেছেন সরকার পক্ষের , তারা এ ব্যাপারে কোনো পর্যায়েই গভীরে যাননি। দৈশিক পরিস্থিতি, ভূ-রাজনীতি, প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্ট্র্যাটেজিক এবং ভূ-কৌশলগত অবস্থান ও সম্পদ-সম্ভাবনা — কিছুই এরা বোঝেননি। যেমন পড়েননি, বোঝেননি এরা সংবিধান; যেমন জানেন না সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের বিষয়বস্তু; তেমনি জানেন না পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত পক্ষ-বিপক্ষের প্রতিক্রিয়া ও বক্তব্য এখন অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা-প্রকাশক বলেই মনে হয়। টেলিভিশনে পক্ষভুক্তদের মূর্খতা প্রকাশক, অসার ও অবান্তর আলোচনা দেখে বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না এরা কিভাবে হালুয়া-রুটির জন্য লালায়িত হয়ে আছেন। বিরোধীরাও পারছেন না তুলে ধরতে বাস্তব পরিস্থিতি ভাসা ভাসা জ্ঞানেই সন্তুষ্ট থাকার কারণে; গভীরতায় না যাওয়ার কারণে। এই চুক্তি, সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের গভীর পাঠ, এগুলির তুলনামূলক আলোচনা এবং পুরো বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে গিয়ে দেখা গেল অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে মাতব্বরী করতে গিয়েই এই চুক্তি করা হয়েছে। সংকীর্ণ স্বার্থেবোধের সংগে যুক্ত হয়েছে উপরের দিকগুলি। এমন সত্য যত দ্রুত জাতি বুঝবে, ততই মঙ্গল। এই চুক্তি কিন্তু দেশকে, আমাদের স্বাধীন অস্তিত্বকে শেষ করে দিতে পারে। এ পথে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামই নয়, চলে যেতে পারে বাংলাদেশও। তাই সততায়, যুক্তিতে, জ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, দূরদর্শিতায়, দেশপ্রেমে ও জাতিব্যাপী সীসাঢালা ঐক্যে ফিরে আসতে হবে। নচেৎ ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

www.pathagar.com

বর্তমান গবেষণা করা হয়েছে হক্কুল ইবাদ পালনের প্রাধিকার থেকে, দেশ বাঁচানোর তাগিদ থেকে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সাক্ষী থাকুন। তিনি আমাদের সহায় হোন।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — এক

গত ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ মঙ্গলবার সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের সবচেয়ে বিতর্কিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত "শান্তিচুক্তি" (???) সম্পাদিত হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে তার কার্যালয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত কম্পিউটারে মুদ্রিত ১৫ পৃষ্ঠার এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সরকারী দলের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং "শান্তিবাহিনী"র পক্ষে "জনসংহতি সমিতি"র সভাপতি জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। এখনকার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার ১৮ মাসের মধ্যে শান্তিবাহিনীর সাথে অনুষ্ঠিত ৭ম দফা বৈঠকের ৭ম দিবসে এই চুক্তি সম্পাদিত হলো। এই চুক্তি শুরু হয়েছে একটি দীর্ঘ বাক্য দিয়ে, যাকে বলা যায় চুক্তির অঘোষিত preamble বা প্রস্তাবনা বা ভূমিকা। এখানে চুক্তির চরিত্র, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা পরে মন্তব্য করবো। কেননা সমগ্র চুক্তিটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে ভূমিকার ঐ দীর্ঘ এক বাক্যের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য কিরূপ।

বর্তমান চুক্তিটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। এগুলি হচ্ছে ঃ "(ক) সাধারণ, (খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ / পার্বত্য জেলা পরিষদ, (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং (ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী"। এই চুক্তির 'ক' খণ্ডে ৪টি ধারা, 'খ' খণ্ডে ৩৫টি ধারা, 'গ' খণ্ডে ১৪টি ধারা এবং 'ঘ' খণ্ডে ১৯টি ধারা রয়েছে। চার খণ্ডে মোট ৭২টি ধারা এবং বহুসংখ্যক উপধারা রয়েছে।

চুক্তির (ক) সাধারণ খণ্ডের ১ নাম্বার ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে "উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সারা দেশের জনগণের তুলনায় কেবল ০.৪৫%-এর জন্যে এই স্বীকৃতি। এর মধ্যে বাংলাভাষী মুসলমানরা বাদ। তার উপর অন্য ১২টির মধ্যে অন্ততঃ ৭টি ক্ষুদে জনগোষ্ঠীকে বাস্তবে বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত চাকমাদের জন্যই অর্থাৎ শুধু ০.২২% মানুষের জন্য এ আয়োজন। অর্থাৎ শতকরা ০১ ভাগের অর্ধেকের অর্ধেকেরও কম মানুষের জন্যে এই বিতর্কিত ব্যবস্থা নেওয়া হলো।

১৯০০ সালের ০১ মে বৃটিশ সরকার নোটিফিকেশন ১২৩ পি.ডি. Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 যা এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে চালু ছিল এবং যা ১৯২০ ও ১৯২৫ সালে সংশোধিত হয় – ঐ বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area বা 'শাসন বহির্ভূত এলাকা' বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর ১৯৮৯ সালে এরশাদ আমলে এই CHTS Regulation 1900 রহিত করা হয় ১৯৮৯ সালের ১৬

www.pathagar.com

নাম্বার আইন দ্বারা (দ্রষ্টব্য–বাংলাদেশ গেজেট, বৃহস্পতিবার, মার্চ ২, ১৯৮৯। ৫ম খণ্ড–বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন ১৩৯৫ / ২ মার্চ ১৯৮৯)। এর ফলে বাংলাদেশে "উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল" বলে কিছুর সুযোগ নেই এবং বাংলাদেশ সরকারের 'শাসন বহির্ভূত এলাকা' বলেও কিছু নেই। এরশাদ আমলের ১৯৮৯ সালের ১৯, ২০, ২১ নাম্বার আইনে অর্থাৎ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার আইন তিনটিতে (দ্রষ্টব্য–বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সোমবার, মার্চ ০৬, ১৯৮৯। ৫ম খণ্ড–বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। ঢাকা, ২২ ফাল্গুন ১৩৯৫ এবং ৬ মার্চ ১৯৮৯) 'উপজাতি অধ্যুষিত একটি বিশেষ এলাকা'-এর কথাটি এসেছে, তথাপি তা কোনোভাবেই বাংলাদেশ সংবিধানের মৌল আইনকে–এর প্রজাতন্ত্রের পরিচয়, জাতিসত্তার সংজ্ঞা, নাগরিকত্বের সংজ্ঞা, জনগণ-এর পরিচিতি এবং সকল নাগরিক-এর নির্বিশেষ সমতাকে অস্বীকার করতে পারে না।

বাংলাদেশ সংবিধানের preamble বা প্রস্তাবনায় এ দেশের ১২ কোটি বা তারও বেশি বনি আদমের পরিচয় অন্য কোনোভাবে নয়, কেবলই একযোগে "আমরা, বাংলাদেশের জনগণ" (We, the people of Bangladesh)। দ্রষ্টব্য– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা। এখানে বাংলাদেশের জনগণ-এর মধ্যে বিশেষ কোনো ভাগ করা, পরিচয় চিহ্নিত করা, বিশেষ এলাকা ভাগ করার কোনোই অবকাশ নেই। সংবিধানের প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী "সমগ্র বাংলাদেশ একটি একক" সত্তা (১ নাম্বার অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' (অনুচ্ছেদ-৩)। সংবিধানের ৬(২) ধারা অনুযায়ী 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন'। এক্ষেত্রে সমগ্র জনসংখ্যাই এককভাবে বাংলাদেশী, সবার 'নাগরিকত্ব'ই 'বাংলাদেশী'। সংবিধানের ৭(১) এবং ৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ দেশের সকল মানুষ এক ঐক্যবদ্ধ সত্তা ও শক্তি হিসেবে কেবলই 'জনগণ'। এক্ষেত্রে কোনো অংশকে 'উপজাতি' বলে চিহ্নিত করার কোনোই সুযোগ নেই। যেহেতু আমাদের জাতি ও নাগরিক সত্তা 'বাংলাদেশী', সেহেতু 'উপজাতি' সত্তার সাংবিধানিক ও আইনী স্বীকৃতি এলে জনগণের বিভাজন ও পক্ষ-বিপক্ষ তৈরি করে 'বাঙালী' সত্তাও চলে আসে। অথচ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সীসা ঢালা প্রাচীর নির্মাণের জন্য 'বাঙালী' পর্যন্ত বিলোপ করা হয়েছে। আর 'উপজাতি' সত্তা বলে কিছুকে সেই ১৯৭২ সালে সংবিধান গ্রহণের দিন থেকে আজ ১৯৯৭ অবধি গ্রহণ করা হয়নি। শেখ মুজিব থেকে শুরু করে কারো সরকারই এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র প্রশ্ন তোলেনি। জনগণও নিজেদের জন্য 'জনগণ' এবং 'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ'– এই ঐক্যের একক পরিচয়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেছে। এভাবে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা', ২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণ', 'জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহ'-এর পরিপোষণ ও উন্নয়ন,

www.pathagar.com

'সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ'-এর কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার এই মূল নীতিগুলিতেও কোনো সুযোগ নেই, জনগণ, জাতিসত্তা, নাগরিকসত্তার পরিচয় বিনষ্ট করে সাংবিধানিকভাবে 'উপজাতি' প্রত্যয়টি তুলে ধরার। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের কোনোই অবকাশ নেই পার্বত্য চট্টগ্রামে। কেননা এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের অস্তিত্বকে বিপদগ্রস্ত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের সম অবস্থান, স্বার্থ, অধিকার খর্ব করে তাদেরকে প্রকারান্তরে সেখানে অবাঞ্ছিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৬, ৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সমতা, সম অধিকার, সম সুযোগ, সম স্বাধীনতাই কেবল স্বীকৃত। ২৮ (৪)-এর এবং ২৯(৩)-এর 'ক' অংশের ব্যাখ্যা পার্বত্যাঞ্চলের চাকমাদের, শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির নিয়ন্ত্রণকারীদের জন্য নয়; বরং তথায় বসবাসকারী বাংলাভাষী মুসলমান ও তথাকার ক্ষুদে মানবগোষ্ঠী তথা পাংখো, বোম — এই বাস্তবে-পশ্চাদপদদের জন্যে যে কাজে লাগানো দরকার, তার স্বীকৃতি বর্তমান চুক্তিতে নেই। 'নাগরিকের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য'– সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদের এই ব্যাখ্যাটি তো ৭২% স্বাক্ষর ও সর্বক্ষেত্রে অগ্রসর অথচ কেবলই ০.২২% চাকমাদের জন্য নয়, বরং তথায় শতকরা ১০ ভাগ স্বাক্ষর অথচ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বাংলাভাষী মুসলমান এবং অন্যান্য আরো পশ্চাদপদ মানবগোষ্ঠীর পক্ষে প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পুরো চুক্তি ও তার বিভিন্ন ধারা-উপধারার ক্ষমতা, সুযোগ ও বিলি-বন্টন মোতাবেক তা গেল এ যাবৎ সকল মাখন উদরস্থ করা ও সর্বাধিক অগ্রসর চাকমাদের হাতে, চুক্তি অনুযায়ী গৃহীতব্য ব্যবস্থানুযায়ী। সরকার কি বুঝলেন না সংবিধানের ৯, ১১, ২৮(৪), ২৯(৩)-ক,খ,গ, ৫৯, ৬০ অনুচ্ছেদ-উপ অনুচ্ছেদগুলির মানে কি হতে পারে সত্যিকার অর্থে? তেমনি কীভাবে লঙ্ঘন করা হলো সংবিধানের মৌলিক অধিকারসমূহ? রাষ্ট্রীয় সংবিধানের চরম অপব্যাখ্যা ও চরম অপব্যবহার করা হলো এর মাধ্যমে। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত বঞ্চিত ও অনগ্রসর বাংলাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠী শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ হয়েও এবং চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা বাদে অন্যান্য ক্ষুদে জনগোষ্ঠী আরো অনগ্রসর থেকেও অগ্রসর হবার অধিকার ও সুযোগ পাবে না। যে চাকমারা এতদিন পাচ্ছিলো একাই, চুক্তির সুযোগে ও পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদে অত্যন্ত বেশি প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতার জোরে এবং প্রথমেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতব্য শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির উপর তাদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের সুযোগে চাকমারা সংবিধানের ২৮(৪) এবং ২৯(৩)-এর প্রকৃত অর্থের উল্টো ব্যাখ্যা করে যাবতীয় অধিকার ও সুযোগ হাতিয়ে নেবে।

মোট কথা, সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন'– এই মৌল বিবেচনাই লঙ্ঘিত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল' বলে স্বীকার করায়। কেননা উপরে

www.pathagar.com

বর্ণিত ও ব্যাখ্যাকৃত সংবিধানের প্রস্তাবনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি (তৃতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত) যা কোর্টে নন-এফোর্সেবল বা আদালতে বলযোগ্য নয়, তা যেমন এই পথে লঙ্ঘিত হচ্ছে; তেমনি সংবিধানের প্রথম ভাগ (প্রজাতন্ত্র) এবং তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার)– এ দু'টির কোর্টে এনফোর্সেবল বা আদালতে বলবৎযোগ্য এবং উপরে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখিত ও ব্যাখ্যাকৃত অনুচ্ছেদগুলিও লঙ্ঘিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত ১৯৮৯ সালের জাতীয় সংসদে পাশকৃত আইনেরও কোনো সুযোগ নেই সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের এতগুলি নীতিগত ও আইনগত ধারাকে আঘাত করার বা অস্বীকার করার। সংবিধানের প্রস্তাবনায় কোনো বদল (যা 'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ'– এই মৌল স্বীকৃতির লংঘনের মাধ্যমে করা হয়েছে চুক্তিতে) আনতে হলে ১৪২(১) অনুচ্ছেদের (আ) শর্ত মোতাবেক সংসদে মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত বিল এবং ১৪২ (১ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাত দিনের মধ্যে ব্যবস্থাকৃত গণভোটের সম্মতির শর্ত পূরণ করতে হবে। তাই বর্তমান পার্বত্য চুক্তি 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল'-এর স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান — এর প্রস্তাবনা, প্রজাতন্ত্র, জাতি ও নাগরিক সত্তা, জনসত্তা, মূলনীতি আর আদালতে বলবৎযোগ্য প্রথম ও তৃতীয় ভাগের উপরে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাকৃত অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদ, অংশসমূহকে অস্বীকার করেছে। এই চুক্তি জনজীবনে বিভক্তি এনেছে, জাতি ও নাগরিক সত্তাকে খণ্ডিত করেছে এবং রাষ্ট্রের একক সত্তাকে টুকরো করেছে। এই প্রক্রিয়ায় চুক্তিটি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমানত বাবদ প্রাপ্ত জনগণের সার্বভৌমত্ব, জনগণের সর্বোচ্চ অভিপ্রায়, প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন তথা সংবিধানের সঙ্গে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক চুক্তি করে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে, জন ইচ্ছাকে পদদলিত করেছে, অবৈধ কাজ করেছে। কাজেই এদিক থেকে চুক্তিটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। পার্বত্য চুক্তির 'এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ'-ভিত্তিক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ স্বীকৃতিও উপরের ব্যাখ্যানুযায়ী তাই সম্পূর্ণতঃ সংবিধান বিরোধী এবং অবৈধ বিধায় পরিত্যাজ্য। এটি রাষ্ট্রের ভৌগলিক সংহতি এবং রাষ্ট্র, জাতিসত্তা ও নাগরিক সত্তার মনস্তাত্ত্বিক সংহতিকে বিনষ্ট করবে। নিঃসন্দেহে আরো বলা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় উপরে বর্ণিত বিষয়টি দেশে আরো নানাভাবে, নানা অংশে জাতীয় সংহতির জন্যে হুমকি সৃষ্টি করবে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — দুই

পার্বত্য চুক্তির (ক) সাধারণ খণ্ডের ২ নাম্বার ধারানুযায়ী এই চুক্তি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে বহুবিধ আইন-বিধি-রীতি প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজনের বিষয় স্থিরীকৃত হয়েছে। এখানে বিশ্লেষণ এরূপ হতে পারে ঃ

(১) স্বীকার করা হয়েছে এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে গেলে বহু আইন-কানুনের অদল-বদল করতে হবে। যা কেবল লুকানো হয়েছে তা হচ্ছে খোদ সংবিধানকেই বদলাতে হবে অনেক ক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সংবিধানের দশম ভাগের (সংবিধান-সংশোধন) ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করতে গিয়ে ১৪২-এর ১-এর 'ক' উপ-অনুচ্ছেদের (আ) শর্ত পূরণ করতে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধনী গৃহীত হতে হবে। চুক্তির মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনা ও ৫৬ ধারার পরিবর্তন আনায় ১৪২(১) ক-১ অনুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনের পর গণভোটও লাগবে ৭ দিনের মধ্যে ব্যবস্থাকৃত হয়ে। এ না করলে কেবল অজ্ঞতার সুযোগে, জিদের প্রভাবে, প্রতিবাদের অনুপস্থিতিতে গায়ের জোরেই তা করতে হবে। সংবিধান মেনে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সময়কার সংবিধান রক্ষার 'শপথ' বা ঘোষণা (oath or affirmation of office) মোতাবেক কাজ করে বাস্তবে এই চুক্তি, এর উপরে বিশ্লেষিত অংশ এবং এর পরবর্তী কোনো অংশই প্রণয়ন, গ্রহণ, চালু, বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। লক্ষণীয় যে সংবিধানের একাদশ ভাগের (বিবিধ) ১৪৮ অনুচ্ছেদের ১ উপ-অনুচ্ছেদের পদের শপথ অনুযায়ী সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের ২ অংশের শপথ বা ঘোষণায় বলা হয়েছে ঃ বিশ্বস্ততার সহিত দায়িত্ব পালনের কথা; বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণের কথা; সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানের কথা; সকলের প্রতি আইনানুযায়ী যথাবিধি আচরণের কথা। এই চুক্তির মাধ্যমে সেই শপথ আদৌ রক্ষিত হচ্ছে কি?

(২) কেবল সরকার (মাত্র শতকরা ৩৪% ভোটারের সমর্থন নিয়ে টেকনিক্যাল মেজোরিটির জোরে) দেশের জনগণ, সংসদ, সংবিধান, বিরোধী দলসমূহকে একেবারেই উপেক্ষা করে, আর কোনো পক্ষের অংশগ্রহণ ছাড়াই, পার্বত্য বাংলাভাষী মুসলমান অর্থাৎ তথাকার শতকরা ৫০% মানুষকে ছাড়া, তথাকার অন্যান্য ক্ষুদে জনগোষ্ঠীকে ছাড়া, ১৯৭২ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষাকারী সামরিক বাহিনীর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমৃদ্ধ মতামতের অংশগ্রহণ ছাড়া শুধুই চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদী ভারতে-আশ্রিত সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে এবং কেবলই তাদের একাংশের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে গোপন চুক্তি করলেন এবং সব কিছু সেরে জনগণকে পত্রিকা মারফৎ জানালেন যে, সবকিছু "স্থিরীকৃত" হয়ে গেছে। এ দেশ কি মগের মুলুক? এখানে ১২ কোটি মানুষ নেই; সংবিধান, সংসদ, গণতন্ত্র, জনমত, দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠী, অন্যান্য ক্ষুদে জনগোষ্ঠী– কেউ নেই। আছে কেবল আওয়ামী লীগ সরকার ও সন্তু লারমার জনসংহতি ও শান্তিবাহিনী। তা না হলে সব কিছু গোপনে, এরতরফা, গায়ের জোরে, ব্যক্তিক ইচ্ছা ও দলীয়ভাবে করে; কেবল ফুফাতো ভাই ও দলীয় ধামাধরা নেতাকে দিয়ে কেবলই তাদের ও সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীর জ্ঞাতসারে সব কিছু "স্থিরীকৃত" করে জানিয়ে দেওয়া হলো ঃ "এই চুক্তি উভয় পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে" (চুক্তির প্রথম খণ্ডের ৪ নাম্বার ধারা)। এ কাজ, এই চুক্তি সর্ব দিক দিয়েই তাই গণতন্ত্র বিনষ্ট করার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। এছাড়া চুক্তির সাথে সম্পর্কিত সাংবিধানিক আইন, সংসদীয় আইন, বিদ্যমান অন্যান্য আইন যা পাল্টানো প্রয়োজন, তা না করে তো চুক্তি বলবৎ হওয়ার ঘোষণা

www.pathagar.com

দেওয়া বেআইনী। এক্ষেত্রে চুক্তিটি হতে পারে কেবল সমঝোতা স্মারক (MOU) চুক্তির প্রথম খণ্ডের ৩ নাম্বার ধারানুযায়ী চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার জন্যে গঠিতব্য কমিটির কম্পোজিশনও চরম ব্যক্তিক ও দলীয় সংকীর্ণতা ও স্বেচ্ছাচারের উদাহরণ। জনগণ, রাষ্ট্র, সংবিধান, জাতীয় সংসদের উপর চেপে বসে ব্যক্তিগত তালুক হিসেবে রাষ্ট্রকে ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করার এর চেয়ে বড় উদাহরণ কি হতে পারে! এছাড়া দেশের স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ-বিষয়ক এত বড় বিনাশ 'স্থিরীকৃত' করে, 'চুক্তি বলবৎ' হয়ে গেছে ঘোষণা দিয়ে এরপর জনগণকে জানানোর মাধ্যমে তাদের সঙ্গে নিষ্ঠুরতম প্রহসন করা হয়েছে। অবস্থা যেন এমন ঃ "আরে ছাড়ো তোমার জনগণ। তারা কেবল ফুটবলের মতো। আর আমরা সেখানে আছি কেবল তাদেরকে লাথি মারার জন্য"।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — তিন

আশ্চর্য্য লাগে এই ভেবে যে, ০২ ডিসেম্বরে ১৯৯৭-এ সম্পাদিত ও তৎক্ষণাৎ বলবৎকৃত পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-র ১৮ দফা অভিযোগ-আপত্তি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, তা খণ্ডাতে গিয়ে সরকার সংবিধানের ৯, ১১, ২৮(৪), ২৯, ৩৬, ৪২(১), ১৩৬ ইত্যাদি অনুচ্ছেদের এত বেশি মনগড়া, বিকৃত ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিলেন (সরকারের ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য – ভোরের কাগজ, সংবাদ, ০৮ ডিসেম্বর (১৯৯৭)।

সরকার শতকরা মাত্র ০.২২ ভাগ চাকমার ও তাদের গোত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী এবং ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট শান্তিবাহিনীর জন্যে সংবিধানকে এত ঘৃণ্যভাবে পদদলিত করলেন! অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের কন্টিগিউআস্ এবং ইনডিভাইজিবল টেরিটোরী। এটি দেশের এক-দশমাংশ। আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল। সবচেয়ে সম্পদ-সমৃদ্ধ ও ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ১৩টি উপজাতির কেউ এখানের আদি অধিবাসী নয়। বাংলাদেশের এই এককালের backyard-এ চাকমাসহ সব উপজাতি বহিরাগত, অভিবাসী, সেট্লার (দ্রষ্টব্য ঃ ইংরেজ গবেষক লিউইন, হ্যাচিনসন, পার্ন, উইলসন্স। চাকমা গবেষক সতীশ ঘোষ, বিরাজ মোহন দেওয়ান, সুগত চাকমা, সি.আর. চাকমা। ভারতীয় গবেষক দেবযানী দত্ত ও অনুসূয়া রায় চৌধুরী। বাংলাদেশী মুসলমান গবেষক প্রফেসর ড. আবদুল করীম এবং প্রফেসর ড. আলমগীর 'সিরাজুদ্দীন। এছাড়া দ্রষ্টব্যঃ চাকমা লোকগাঁথা এবং চাকমা রাজবাড়ীতে রক্ষিত চাকমা রাজা শের জব্বার খাঁর ব্যবহৃত সীল বা রাবার স্ট্যাম্প)। আজ অসম স্বেচ্ছাচারী চুক্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে এদেশের মূল অধিবাসী বাংলাভাষী শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে নিজ দেশে পরবাসী করা হলো। এই প্রক্রিয়াকে আরো অমানবিক ও খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া হলো পার্বত্য চুক্তির দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'খ' (পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ / পার্বত্য জেলা পরিষদ)-এর ১, ৩, ৪ ধারানুযায়ী তথাকার জনগণকে "উপজাতি" ও "অ-উপজাতীয়"– এভাবে

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট পন্থায় দ্বিধাবিভক্ত করে। যেখানে দরকার ছিল কার্যকর জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে সুসমন্বিত ইতিবাচক এ্যাসিমিলেশনের নীতি গ্রহণ করা, সেখানে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হলো যে এখানে বিপরীত দু'টি পক্ষ রয়েছে। স্থায়ী দ্বন্দ্ব, সংঘাত, শত্রুতা তৈরি করা হলো। চুক্তির দ্বিতীয় বা 'খ' খণ্ডের ৩ নাম্বার ধারায়, অ-উপজাতীয়-এর সংজ্ঞা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া ৪ ধারার 'ঘ' উপধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মৌজার উপজাতীয় হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান / পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের উপজাতীয় চীফের স্থিরীকরণ ও সার্টিফিকেট প্রদান মাধ্যমে কেবল বাংলাভাষী কেউ পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অ-উপজাতীয়'-এর সংজ্ঞায় পড়বে। আর বাকিরা বহিরাগত বিবেচিত হবে। তারা নির্বাচনে অ-উপজাতীয় পদে দাঁড়াতে পারবে না।

এ-তো খুবই স্পষ্ট যে, উপজাতীয় হেডম্যান, চেয়ারম্যান, সার্কেল চীফ– কেউই বাংলাভাষী বাঙালী কোনো প্রার্থীকে অ-উপজাতীয় সংজ্ঞাভুক্ত করতে চাইবে না। কিংবা নির্বাচনে অ-উপজাতীয় পদে প্রার্থী পোটেনশিয়াল ও স্বীয় অংশের দাবি আদায়ে সক্ষম বাঙালী কাউকে আসতে দিতে চাইবে না অ-উপজাতীয় নয় বলে ঘোষণা দিয়ে। উপজাতীয় সার্কেল চীফেরও ভূমিকা হবে স্বভাবতঃই বাঙালী বিরোধী। চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের চরম নিয়ন্ত্রণে নিজেদের চাকরি ও ভাগ্যকে বন্দী রাখা অবস্থায় উপরোক্ত ব্যাপারে কোনো কর্মকর্তার পক্ষে কোনো যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়। আর চুক্তি মোতাবেক তাদের এ ব্যাপারে কোনো এখতিয়ারও নেই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলাভাষী নাগরিককে আজ নিজ দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশী, বাঙালী কি-না সেজন্যে নয়, বরং শুধুই অ-উপজাতীয় কি-না – এই সার্টিফিকেট আদায় করে কেবলই নিজেদের জন্যে বরাদ্দকৃত খুব সামান্য সংখ্যক আসনে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ ভিক্ষা করতে হবে। এখানে সংবিধান, বাংলাদেশী জাতীয়তা, রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিকত্ব–কিছুই তাকে defend করবে না। নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন বিধিও তাকে defend করবে না। কেবল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী এক ক্ষুদে অথচ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন প্রতিপক্ষের mercy-র উপর নির্ভর করতে হবে। এহেন ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় ও ঔপনিবেশিক শক্তিই কেবল প্রজাকূলের উপর চাপাতে পারে। আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাভাষী জনগণের উপর, নিজ দেশে বাইরে থেকে আগত অভিবাসী শতকরা ০.২২ ভাগ মানুষের সন্ত্রাসী নেতৃত্বকে খুশি করার জন্যে এবং স্বীয় ক্ষমতার স্বার্থ রক্ষা ও প্রতিবেশী ভারতের থাবা বিস্তারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য উপরোক্ত অবমাননাকর চুক্তি ও সম অধিকারহীনতা চাপিয়ে দিয়েছে। এই বিধান রাষ্ট্রের ঐক্য ও শান্তি বিনষ্ট করবে অচিরেই। এটি বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগের ১ নাম্বার অনুচ্ছেদের প্রজাতন্ত্রের একক চরিত্রকে ধ্বংস করছে। এটি সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১ অনুচ্ছেদের গণতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণকে বিনষ্ট করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাভাষী নির্বাচিত প্রতিনিধির কার্যকর অংশগ্রহণকেও বানচাল করছে। এটি সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদের সকল নাগরিকের

www.pathagar.com

জন্য সুযোগের সমতা এবং ১৯(২) অনুচ্ছেদের মানুষে মানুষে অসাম্য বিলোপ, সম্পদের সুষম বন্টন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম-স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণকে অসম্ভব করে তুলবে। এছাড়া এটি কোর্টে এনফোর্সেবল সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ৩২, ৩৬, ৪২ অনুচ্ছেদকে বানচাল করছে। তদুপরি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে-কারো পক্ষে দেশের যে-কোনো স্থানে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকলেও এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা পরিষদগুলির নির্বাচনে সেখানকার কোনো বাংলাভাষী তথাকার বাসিন্দা হলেও মৌজার হেডম্যানসহ উপজাতীয়দের এবং শান্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত উপজাতীয় সার্কেল চীফের কাছ থেকে অ-উপজাতীয় এবং স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত নিজেদের জন্য সংরক্ষিত সামান্য সংখ্যক আসনেও দাঁড়াতে পারবে না। মৌলিক অধিকার হরণের এবং সাম্য ও গণতন্ত্র বিনাশের এর চেয়ে জঘন্য দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে! এই প্রক্রিয়ায় দেশের নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার এবং নির্বাচন বিধিসমূহকেও নস্যাৎ করা হয়েছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — চার

এরপর পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২ নাম্বার ধারায় জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১৯৮৯ সালে প্রণীত "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" ধারণা ও ব্যবস্থাটি বদলে ফেলে "পার্বত্য জেলা পরিষদ" করা হয়েছে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলাকে বাদ দিয়ে কেবল ৩টির জন্যে নতুন এবং আলাদা মর্যাদার পরিষদের ব্যবস্থার করা যায় কি? সংবিধানে বদল এনে ১৯৮৯-এর আইনের সংশোধন এ জন্যে প্রয়োজন। সারা দেশে যেখানে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের "প্রশাসনিক একাংশ" হিসেবে কাজ করছে সংবিধান মোতাবেক, সেখানে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রত্যয়দ্বয় কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে উচ্ছেদ করে একে বিশেষ আঞ্চলিক মার্যাদা দিয়ে এক দেশে দুই নীতি নেওয়া কি ন্যায়ানুগ, সঙ্গত, সমতানির্ভর ও বৈধ? দেখা যাচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা শান্তিবাহিনী এখন একদিকে যেমন 'স্থানীয় সরকার' কথাটি তুলে দিয়ে নিজেদের মর্যাদা enhance করার ব্যবস্থা করেছে, তেমনি 'ডেপুটি কমিশনার'-এর সার্টিফিকেট প্রদান ক্ষমতা বাতিল করে 'সার্কেল চীফ'কে সেই অধিকার দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ তিন জেলার ডিসির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হ্রাস করেছে। এক দেশের, এককেন্দ্রিক এক রাষ্ট্রের মধ্যে সারা দেশে একরকম এবং কেবল তিন জেলায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ বাংলাদেশের সংবিধান দেয়নি। এতে করে বাংলাদেশের oneness-এর বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়েছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — পাঁচ

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৫ নাম্বার ধারায় ১৯৮৯ সালের তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৭ নাম্বার ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে "চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বিভাগীয় কমিশনারের" সম্মুখে শপথ গ্রহণের বা ঘোষণা দানের যে বিধান রয়েছে, সেটির বদলে এখন থেকে "হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করবেন — এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমতঃ সংবিধানে গৃহীত ১৯৮৯ সালের আইন না-পাল্টেই এটি করা সম্ভব নয়। অথচ চুক্তি স্বাক্ষরের মুহূর্ত থেকেই বলবৎ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্বের দুই ক্ষেত্রে স্টেটাস বাড়িয়ে ও বিশিষ্ট করে এবার এক লাফে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা হল পার্বত্য তিন জেলা পরিষদের মর্যাদা। বাংলাদেশ সংবিধানে ১৫২ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা (Interpretation) অনুযায়ী "হাইকোট ডিভিশন" হচ্ছে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোট বিভাগ। পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে চাকমা শান্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে যে তিন পার্বত্য জেলায়, সেখানকার ওই ব্যবস্থা দেশের অন্য ৬১টি জেলায় নেই বা করা হচ্ছে না। এক দেশে দুই বিধান। নাগরিক, অঞ্চল, পরিষদের অসম মর্যাদার বিধান করা হল। এটি কীভাবে সংবিধানসম্মত? কীভাবে গণতান্ত্রিক? কীভাবে সম অধিকারভিত্তিক? কীভাবে সম মর্যাদা ও সুযোগভিত্তিক? কেন এই বিশেষ দূরভিসন্ধিমূলক আনুকূল্য প্রদান করা হচ্ছে দেশের এক বিশাল অংশের উপর অশুভ নখর বিস্তারকারী অতি ক্ষুদে এক বহিরাগত গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী বাহিনীকে কর্তৃত্ব করতে দিয়ে? কেন জনগণ এসব মেনে নেবে? এসব তো বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। এখন বাংলাদেশের মধ্য থেকে জন্ম দেওয়া হচ্ছে আরেক দেশের।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — ছয়

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৫ নাম্বার ধারানুযায়ী "চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার"-এর মর্যাদা ও কাজ এক দফা কেড়ে নিয়ে ৬ নাম্বার ধারানুযায়ী আরো কেড়ে নেওয়া হলো। আগে ১৯৮৯ সালের আইনের ৮ নাম্বার ধারানুযায়ী চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তার ও তার পরিবারের সম্পত্তির, স্বত্বের দখলের, স্বার্থের লিখিত হিসাব বিবরণী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দাখিল করতো। এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৬ নাম্বার ধারানুযায়ী তা "নির্বাচন বিধি অনুসারে" সমাধা করা হবে। অর্থাৎ চট্টগ্রামের কমিশনারের এখতিয়ার, ক্ষমতা, মর্যাদা গেল। ওদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আওতায়, উপজাতি এবং বাস্তবে সন্তু লারমা ও শান্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত পরিষদ, প্রশাসন ও নির্বাচনের পর হিসাবের কড়াকড়ি যেমন উপজাতীয়দের বেলায় সহজ হবে, তেমনি বাংলাভাষীদের ছিটে-ফোটা প্রতিনিধিত্বের বেলায় শক্ত হবে। তদুপরি এখানেও ঐ মর্যাদা enhance করার ব্যাপার স্পষ্ট। কিন্তু কেন? আবার, দেশের অন্যত্র তো এমন সুযোগ নেই।

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৭ নাম্বার ধারা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে সংসদ কর্তৃক পরিবর্তন না করেই এর ১০ নাম্বার ধারা বদল করে জেলা পরিষদের মেয়াদ তিন বছর থেকে পাঁচ বছর করা হয়েছে। এর মাধ্যমেও ঐ তিন জেলায় এককভাবে উপজাতীয় কর্তৃত্বকে অধিকতর মাত্রায় প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — সাত

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৮ নাম্বার ধারানুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদত্রয়ের উপর বাংলাদেশ জাতীয় সরকারের সামান্যতম নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব যেটুকু ছিল, তাও লোপ করা হয়েছে। একে তো এক্ষেত্রে উপজাতীয় ছাড়া বাঙালী কেউ চেয়ারম্যান হতে পারবে না– এমন জঘন্য অসম অগণতান্ত্রিক বিধান ১৯৮৯ সালের আইন মারফৎ এরশাদ সরকার করে গিয়েছিল। তদুপরি আগে চেয়ারম্যান পদ কোনো কারণে শূন্য হলে, কিংবা চেয়ারম্যানের অসুস্থতা, অসামর্থ্য, অনুপস্থিতিতে সরকার কেবল উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হতে একজন চেয়ারম্যান রূপে কাজ চালানোর জন্য মনোনীত করতো। এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৮ নাম্বার ধারানুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের ঐ সামান্য অধিকারটুকুও নেই। চেয়ারম্যান পদে চিরস্থায়ীভাবে বাংলাভাষীদের, বাঙালীদের (অ-উজাতীয়দের) বঞ্চিত করার চরম অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এরশাদ ১৯৮৯ সালে করে গিয়েছিলেন। এবার তার দলের সঙ্গে ঐকমত্যের সরকার-প্রধান শেখ হাসিনার সময় চুক্তি করে চেয়ারম্যানের পদে শূন্যতা বা তার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্যকে সভাপতি তথা চেয়ারম্যান করার বিধান করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পরিষদে জনসংখ্যার আনুপাতিক বিবেচনায় শোচনীয়ভাবে কম প্রতিনিধিত্ব লাভকারী বাংলাভাষী বাঙালী করুণ সংখ্যালঘু সদস্যদের এক্ষেত্রে কিছু করার থাকবে না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে উপজাতীয় সদস্যই বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারাই সিদ্ধান্ত নেবে, কে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পরিষদের ব্যাপারে বাঙালীদের কোনো ক্ষমতা নেই; চেয়ারম্যানের শূন্য স্থান পূরণে ১৯৮৯ সালে প্রদত্ত বাংলাদেশ সরকারের খুবই সীমিত ক্ষমতাও লুপ্ত হলো; আর বাঙালী সদস্যরা এক্ষেত্রে কার্যতঃ একেবারেই অস্তিত্বশূন্য অবস্থায় নিপতিত হলো।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — আট

আবার পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৯ নাম্বার ধারানুযায়ী ভোটার তালিকাভুক্তির নতুন যোগ্যতা নির্ধারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের বঞ্চিত করা হলো। মৌলিক অধিকার বিরোধী, অগণতান্ত্রিক ও অসম-অন্যায় বিধান চাপিয়ে দেওয়া হলো। ১৯৮৯ সালের আইনের ১৭ নাম্বার বিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত এই পার্বত্য তিন জেলার যার যার ভোটার তালিকা দিয়েই যে-কোনো নির্বাচনের ভোটার নির্ধারিত হতো। ১৯৮৯ এর আইনের ১৮ নাম্বার আইনেও এই সুযোগকে বিস্তৃত করা হয়েছিল। কিন্তু এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৯ নাম্বার ধারানুযায়ী ভোটার হবার যোগ্যতা-তালিকা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আর সবচেয়ে বিপজ্জনক শর্ত হচ্ছে "পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা" হবার ব্যাপারটি। এটি না হলে কেউ সেখানে ভোটার হতে পারবে না, ভোটও দিতে পারবে না। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বিশাল সংখ্যক ভূমিহীন

www.pathagar.com

বাঙালী এবং ১৫/২০ ধরে সরকারের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে জীবিকা নির্বাহকারী বাঙালীসহ শতকরা ৮০ ভাগ বাঙালী ভোটাধিকার বঞ্চিত এবং পরিণামে বিতাড়িত হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে। এভাবে বাইরে কর্মরত অনেক বাঙালী ভোট দানে বঞ্চিত হবে। এখানে এই অগণতান্ত্রিকতার সাথে পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩ নাম্বার ধারার "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দার" সংজ্ঞা এবং ৪ নাম্বার ধারার সার্টিফিকেট অর্জনের বিষয়দ্বয় পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণামে বাঙালীদের ভোটের নাগরিক রাজনৈতিক অধিকারকেও মারাত্মকভাবে সঙ্কুচিত বা হরণ করবে। এটি নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব ও এখতিয়ারকে খর্ব করছে। এটি সংবিধানের সপ্তম ভাগের (নির্বাচন) ১২১ নাম্বার অনুচ্ছেদের প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকার বিধানকে অস্বীকার করছে। ১৯৮৯ সালের আইনেও এই একমাত্র ভোটার তালিকা অনুসরণের নির্দেশ আছে। কাজেই আরেকটি ভোটার তালিকার এই ধারাও সংবিধান বিরোধী — কি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে, কি নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে, কি সংবিধানের ১২১ এবং ১২২ নাম্বার অনুচ্ছেদের বিবেচনায়, যেহেতু এ দু'টির সঙ্গে যোগ রয়েছে ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ১৭ নাম্বার ধারার। তাছাড়া জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত ১৯৮৯ সালের আইনের ১৭ এবং ১৮ নাম্বার ধারাও এজন্যে পরিবর্তন করা দরকার। তা না করেই স্বেচ্ছাচারী বঁদলের মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়টি চুক্তিতে ঢুকেছে এবং চুক্তি প্রস্তাবিত না হয়ে ইতোমধ্যে বলবৎও হয়ে গেছে।

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ১০ নাম্বার ধারায় ১৯৮৯ সালের আইনের ২০ নাম্বার ধারার (২) উপধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি বসানোর ব্যবস্থা কেবলই উপজাতি প্রাধান্যশীল আট-ঘাট বাঁধা নির্বাচনকে আরো নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা বাবদ প্রদত্ত বলে মনে হয়।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — নয়

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ১৩ নাম্বার ধারা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের আইনের ৩১ নাম্বার ধারানুসারে জেলার ডেপুটি কমিশনারের পরিষদের সচিব হবার যে সরাসরি বিধান রয়েছে, তা বাতিল করে উপসচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হবেন, এমন বিধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে কেবল ডেপুটি কমিশনারের কাজের আওতা ও কর্তৃত্ব গেল তা-ই নয়, বরং সেই চুক্তির ১৩ নাম্বার ধারায় 'এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে'– এই ব্যবস্থা করায় পার্বত্য তিন জেলায় পরিষদের কাজে জাতীয় সরকারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং বাঙালী সরকারী কর্মকর্তার কাজ করার সুযোগটুকুও কেড়ে নেওয়া হল। পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে 'বাঙালী খেদাও' আন্দোলনের এটি একটি নমুনা। এখন, কোনো অধিকার আছে কি সরকারের এমন চুক্তি করার? কেন শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ইচ্ছামতো দাবী মেনে নেওয়া হলো? এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সরকারের নিয়ন্ত্রণ একে একে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া এভাবে টার্ম ডিক্টেট করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র উপজাতীয় কর্মকর্তা দিয়ে ভরলে একই রকম দাবী যদি বাংলাদেশের আরো ৬১টি জেলা উত্থাপন করে, তবে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে? সরকার তখন কি করবেন? আর তখন যদি সরকার এমন ব্যবস্থা না নেন, তাহলে সারা বাংলাদেশকে একরকম ভাবে রেখে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম কেন অন্যভাবে চলবে? এমন বিশেষ সুযোগ লাভের বিধান কেন দেওয়া হচ্ছে চুক্তি মারফৎ? এসব কিছুই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর রাষ্ট্রীয়, সংসদীয়, সরকারী কর্তৃত্বের দ্রুত সর্ববিধ অবসানের চিত্রই তুলে ধরে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — দশ

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ১৪ নাম্বার ধারায় ক, খ এবং গ উপধারা জুড়ে দিয়ে ১৯৮৯ সালের আইনের ৩২ নাম্বার ধারায় পরিষদকে প্রদত্ত বিশাল অধিকারকে এখন চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগে ৩১(১) ধারা অনুযায়ী সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করার অধিকার ছিল। এখন সরকারের 'পূর্বানুমোদনক্রমে'-র স্থলে কেবল 'অনুমোদনক্রমে' হয়েছে। অর্থাৎ prior permission-এর দরকার নেই। পদ সৃষ্টি করে এবং এর জন্যে আর্থিক দায় সরকারের উপর চাপিয়ে পরে অনুমোদন করিয়ে নিলেই চলবে। এমন অধিকার বাংলাদেশের অন্যত্র কারো নেই। ১৯৮৯ সালের আইনের ৩২(২) ধারায় পরিষদ কর্তৃক প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিলঃ "তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে"। এখন এটি সংসদের আইন যথাবিধি সংশোধন না করেই সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করে ১৪ (খ) ধারায় যেভাবে করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ "তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাঙালী মার খেলো। সংখ্যানুপাত তো গেলই, উপরন্তু উপজাতীয় অগ্রাধিকার চেপে বসলো। এছাড়া চাকমা শান্তিবাহিনী চালাকী করে বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যেকার সংখ্যানুপাত বজায় রাখার বিষয়টিই লোপ করলো। একদিকে বাঙালীদের এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্র উপজাতিদের মৌলিক অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগ বিনষ্ট করলো। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযোগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে" এবং ২৯(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না"। এই বিধানদ্বয় স্পষ্টত লঙ্ঘন করা হয়েছে পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ১৪ (খ) ধারানুযায়ী। এছাড়া চুক্তির এই ধারার দ্বারা বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সংবিধানের ২৮(১) ধারাও লঙ্ঘিত হয়েছে। সংবিধান ২৮(৪) অনুচ্ছেদের সুযোগ এক্ষেত্রে অগ্রসর ও বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত চাকমারা নয়, বরং পার্বত্য বাঙালীরা এবং অন্যান্য উপজাতি পেতে পারে। তাছাড়া ২৮(৪) অনুচ্ছেদের শর্ত দ্বারা ২৯(১) এবং ২৯(২) অনুচ্ছেদকে অগ্রাহ্য করা যায় না, কেননা ২৮(৪) কেবল ২৮(১), ২৮(২) এবং ২৮(৩) এর জন্য বাস্তব বিবেচনায় প্রয়োজনমত প্রযোজ্য। ২৯(১), ২৯(২) এর অধিকার ২৯(৩) এর শর্ত দ্বারা লঙ্ঘন করা যায় না, যখন বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে অনগ্রসর নয়, বরং সবচেয়ে বেশী অগ্রসর চাকমা অংশই এর ফলে একচ্ছত্র অধিকার, সুযোগ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব পেয়ে যাচ্ছে। সেখানকার অনগ্রসর বাঙালী ও ক্ষুদে ৭ টি উপজাতিকে তো বাস্তবে বঞ্চিত করা হলো। এভাবে জনমত ও সংবিধানকে একবার পদদলিত করে, সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে সন্ত্রাসী দেশদ্রোহী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করায় বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ট ভাগের (বিচার বিভাগ) ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি' (any person aggrieved) মৌলিক অধিকার বলবৎ রাখা ও বিচার চেয়ে হাইকোর্ট ডিভিশনে আবেদন করতে পারে। আরেকটি কথা, পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ১৪ (খ) ধারার শর্ত দিয়ে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) ১৯(১) এবং ১৯(২) অনুচ্ছেদের সুযোগের সমতার বিষয়টিও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ নীতিগত ও আইনানুগ উভয় দিকেই কাজটি খারাপ হয়েছে এবং অবৈধও হয়েছে। তাছাড়া সংবিধানের প্রথম ভাগ (প্রজাতন্ত্র)-এর ৭(১) অনুচ্ছেদের "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে" — এটি উপরোক্ত অবস্থায় লঙ্ঘিত হচ্ছে। একইভাবে ৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে"। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সরকারের ঐ চুক্তির এবং উল্লিখিত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী চুক্তিকে আইনীরূপ দেওয়ার কোনোই অধিকার ও সুযোগ নেই। এ কাজ তাই পুরোপুরি সংবিধান বিরোধী এবং এর প্রাধান্য খর্বকারী। কোর্টে এনফোর্সেবল সাংবিধানিক ধারা ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে যে কোনো ব্যক্তি অতি অবশ্যই আদালতে বিষয়টি আনতে পারে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — এগারো

১৯৮৯ সালের আইনের ৩২(৩) ধারানুযায়ী ব্যবস্থা এই যেঃ "পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে"। এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ১৪ (গ) ধারানুযায়ী সরকার এ কাজ নিজে থেকে করতে পারবে না। সরকার 'পরিষদের পরামর্শক্রমে' এ কাজ করবে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় সরকার তার ৬১টি জেলার ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখলেও 'পার্বত্য জেলা পরিষদ' নামে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এই তিন জেলার পরিষদের কাছে নিজের ক্ষমতাসীমাকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে। বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগের (বাংলাদেশ কর্মবিভাগ) ২য় পরিচ্ছেদে বর্ণিত সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব পালনও এ পথে বিঘ্নিত হবে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — বারো

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৩৮(১) এবং ৩৮(২) উপধারায় পরিষদকে বাজেট করার বিধান দেওয়া হয়েছে। এদিকে ৩৮(৩) উপধারায় বলা হয়েছেঃ "উপ-ধারা (১)এর অধীনে বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার আদেশ দ্বারা বাজেটটি সংশোধন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে"। এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ১৮ নাম্বার ধারানুযায়ী ১৯৮৯ সালের আইনের "৩৮ নম্বর ধারার উপধারা (৩) বাতিল করা হইবে"। অর্থাৎ পার্বত্য তিন জেলার পরিষদের বাজেটের ব্যাপারেও বাংলাদেশ জাতীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লোপ পেয়ে সীমিত হয়ে গেল। ঐ জেলা তিনটির উপর সরকারের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পেলো। এসবও সরকার সংসদের আইন সংশোধন না করেই স্বীকার করে নিয়েছে এবং চুক্তি বলবৎ হয়ে গেছে বলে লিখিত দলিল মারফৎ স্বীকৃতি দিয়েছে। সরকার কি বাংলাদেশের অন্য কোনো জেলাকে এমন ক্ষমতা দেবে এবং তার উপর থেকে নিজের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে আনবে? যদি না আনে, তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? কেন পার্বত্য জেলা তিনটিই কেবল স্পেশাল স্টেটাস পাবে? কেন তাদের ক্ষমতা সীমা ছাড়ানো হবে এবং অন্য কারো মোটেও তেমন ক্ষমতা থাকবে না?

১৯৮৯ সালের আইনের ৩৮ ধারার (৪)-উপধারা অনুযায়ী "কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে"।

উপরোক্ত উপধারাটি সংশোধন করে নতুন উপধারা প্রণয়নের ঘোষণা দিয়ে পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ১৮ নাম্বার ধারায় বলা হয়েছে ঃ "কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে"। দেখা যাচ্ছে, শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী নেতৃত্ব যেভাবে যা চেয়েছে তা-ই দিয়ে সরকার নিজে কৃতার্থ হয়েছে। এতে করে যে, আর্থিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে; ইচ্ছে-সময়-সুযোগ মতো অন্যায় আবদার করা যাবে; হাতিয়ে নেওয়ার মতলবে যখন ইচ্ছা, যতদিন সুযোগ আছে ততদিন, পার্বত্য তিন জেলা, আর্থিক দায় বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপিয়ে undue advantage নেবে, সে খেয়াল কি আছে সরকারের?

www.pathagar.com

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — তেরো

১৯৮৯ সালের আইনের ৪২ ধারানুযায়ী পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদকে যে-এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল তিনটি উপধারা মারফৎ, সেসবের সঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন একটি উপধারা পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ১৯ ধারায় সংযোজন করা হয়েছে। এটি নিম্নরূপ ঃ "পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে"। এই নব উপধারার সংযোজনের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা পরিষদ তিনটির স্বায়ত্তশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা ও এখতিয়ার বহুগুণে বিস্তৃত হয়েছে। চারদিক থেকে এভাবে বাংলাদেশ সরকারের এখতিয়ার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করে পার্বত্য তিনটি অঞ্চল তথায় আঞ্চলিক পরিষদরূপী ফেডারেল কাঠামোর অঙ্গ রাজ্যের মর্যাদার অবস্থায় যেন চলে আসছে। অথচ বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগের (প্রজাতন্ত্র) ১ নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'বাংলাদেশ একটি একক' রাষ্ট্র (unitary state)। এখানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বা ফেডারেল কাঠামোমূলক ব্যবস্থা বা স্পেশাল স্টেটাস দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। অথচ পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক কেবলই পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর তিন জেলা সামগ্রিকভাবে চাকমা শান্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এসবই পাচ্ছে। সরকার কি দেশের অন্যান্য অঞ্চলকে এহেন কর্তৃত্ব ও সুযোগ দেবে? যদি না দেয়, তাহলে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম পাচ্ছে কেন? সরকার কেন দেশে অসম দুই ব্যবস্থা চালু করছে? তাছাড়া এসবও হয়েছে সংসদকে বাদ দিয়ে, বাইরে গায়ের জোরে গোপন চুক্তি করে। সেই চুক্তি বলবৎ করার ঘোষণা দিয়ে তবেই মাত্র প্রকাশ করা হয়েছে। কেন জনগণ এসব কাজ-কারবার মেনে নেবে? এই চুক্তি বিদেশ-চুক্তি না হলে পূর্বাহ্নের এই গোপনীয়তা কেন রক্ষা করা হয়েছে?

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — চৌদ্দ

১৯৮৯ সালের আইনের ৪৫ নাম্বার ধারার (২) উপধারায় বলা হয়েছে ঃ

"কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপের বা উহার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে সরকার যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে"। পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২০ নাম্বার ধারানুযায়ী "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি এখানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আপাতঃদৃষ্টে এই কেবল এক শব্দ বদলে আরেক শব্দ কায়দা করে বসিয়ে দেওয়ায় বিষয়টিই উল্টে গেল। কেননা আগে যে বিষয়টি নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারের হাতে ছিল, এখন সেটি পার্বত্য তিন জেলা পরিষদের হাতে চলে গেল। জাতীয় সরকারকে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতাচর্চার প্রশ্নে তার জায়গা দখল করলো জেলা পরিষদ। সরকার বাংলাদেশের অবশিষ্ট ৬১ জেলায় কি

www.pathagar.com

এরকম ও উপরে বর্ণিত রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? না করলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় দেশদ্রোহী শান্তিবাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে যে কাঠামো, তার হাতে এ ক্ষমতা দিচ্ছেন কেন? স্পষ্টতঃই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সরকার অধিকার, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ গুটিয়ে আনছেন চুক্তি মোতাবেক। সরকারকে এই অধিকার কে দিয়েছে?

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — পনরো

১৯৮৯ সালের আইনের ৫০, ৫১, ৫২ নাম্বার ধারাগুলি একটু দেখা দরকার বর্তমান পার্বত্য চুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝার জন্য। ৫০ নাম্বার ধারায় বলা হয়েছে ঃ

"পরিষদের উপর তত্ত্বাবধান।–এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার পরিষদের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে"। ১৯৮৯ সালের আইনের ৫১ নাম্বার ধারায় বলা হয়েছে ঃ "পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ।– (১) সরকার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ কর্তৃক বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার আদেশ দ্বারা–

(ক) পরিষদের কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে;

(খ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব অথবা প্রদত্ত কোন আদেশের বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে;

(গ) প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিষদকে আদেশে উল্লিখিত কোন কাজ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে"।

১৯৮৯ সালের আইনের ৫২ নাম্বার ধারায় বলা হয়েছে ঃ

"পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত।– (১) সরকার, স্বেচ্ছায় অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, পরিষদের বিষয়াবলী সাধারণভাবে অথবা তৎসংক্রান্ত কোন বিশেষ ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত তদন্তের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীতব্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্যও নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের প্রয়োজনে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণের জন্য Code of Civil Procedure, 1908 (Act. V of 1908) এর অধীন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে"।

এখন ১৯৮৯ সালের আইনে অনেক বেশি দিয়েও ৫০, ৫১, ৫২ ধারা অনুযায়ী সরকারের হাতে যেটুকু ক্ষমতা ছিল তা বর্তমান পার্বত্য চুক্তিতে একেবারেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এই চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২১ নাম্বার ধারায় বলা হয়েছে যে "৫০, ৫১ ও ৫২

www.pathagar.com

নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তৎপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামাঞ্জস্য সাধন নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে"।

১৯৮৯ সালের আইনের ৫০, ৫১, ৫২ নাম্বার ধারা তিনটি সম্পূর্ণ বাতিল করে পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২১ নাম্বার ধারায় যেটুকু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (উপরে উদ্ধৃত), তা রীতিমত আশংকাজনক। কার্যতঃ এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের এবং এর তিন জেলার উপর বাংলাদেশ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রায় পুরোপুরি বিলুপ্ত হলো। বর্তমান চুক্তির 'গ' খণ্ডের 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ'-এর বিষয়াদি এবং 'খ' খণ্ডের পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদি একত্রে মিলিয়ে এবং বাংলাদেশের সংবিধান ও ১৯৮৯ সালের আইনের সঙ্গে তুলনা করলে এমনটি মনে হতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কার্যতঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, এর উপর বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাচ্ছে। আর তিনটি পার্বত্য জেলাকে প্রদেশ বা প্রায় স্বাধীন রাজ্য করে যেন একটি কনফেডারেল কাঠামো বা কমপক্ষে স্বতন্ত্র ফেডারেল কাঠামোর রাষ্ট্র অবয়ব পাচ্ছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — ষোল

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৫৩ ধারার ১ উপধারার শর্ত অনুযায়ী জেলা পরিষদকে দায়িত্ব পালনে অসামর্থ্য, প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসামর্থ্য, জনস্বার্থ বিরোধী কাজ, ক্ষমতার সীমা লঙঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হবার পর সন্তুষ্ট না হতে পারলে সরকার পরিষদের মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের জন্যে এটিকে বাতিল করতে পারে। এমন অবস্থায় সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে বলে ১৯৮৯ সালের আইনের ৫৩ ধারার ২ উপধারার 'খ' অংশে বিধান রয়েছে। অতঃপর একবার পরিষদ বাতিল হলে তা কিভাবে পুনর্গঠিত হবে, সে সম্পর্কে ১৯৮৯ সালের আইনের ৫৩ ধারার ৩ উপধারায় বিধান দেওয়া আছে। বলা হয়েছে ঃ "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে"।

আর এখন ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২২ ধারায় উপরোল্লিখিত বিষয়টি লক্ষণীয়ভাবে পাল্টে দেওয়া হচ্ছে এভাবে ঃ "৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া

www.pathagar.com

তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে"।

এক্ষেত্রে পরিবর্তন কোথায় হল তা দেখা দরকার। এই পরিবর্তন হল অযোগ্য, অসমর্থ, জনস্বার্থ বিরোধী কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহারকারী পরিষদকে প্রমাণ সাপেক্ষে বাতিল করার পর যা-কিছু ক্ষতি হয়েছে, সমস্যা ঘটেছে, সে সবের প্রতিবিধান করার পূর্বেই আবার নব্বই দিনের শর্তের মাধ্যমে ঐ পরিষদই ক্ষমতায় বসে যাবে। কেননা পার্বত্য জেলা তিনটির বিশেষ অবস্থায় এবং এখনকার (১৯৯৭ সালে এসে) বিশেষ বাস্তবতায় উপজাতি অর্থাৎ মূলতঃ চাকমা শান্তিবাহিনীর একচ্ছত্র কর্তৃত্বশীল পরিস্থিতিতে নব্বই দিনের মাথায় অভিযুক্ত-অপসারিত পরিষদই বসে যাবে ক্ষমতায়। এক্ষেত্রে বিকল্প আসার তো সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতা এভাবে পরিষদ বাতিল প্রশ্নে এবং এই বাতিলের মেয়াদের ব্যাপারে আরো সঙ্কুচিত করে দেওয়া হল। তৃতীয়ত, সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ যে বাতিলকৃত পরিষদের সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্যে কিছুটা সময় বা স্কোপ পাবে, তারও উপায় রইলো না। চতুর্থত, এর ফলে কার্যতঃ পার্বত্য পরিষদ তিনটির ক্ষেত্রে অসামর্থ্য, ব্যর্থতা, প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, জনস্বার্থ বিরোধিতা, ক্ষমতার সীমা লঙঘন ও অপব্যবহার রোধে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা আর যথার্থ অর্থে চালু রইলো না। এ অবস্থায় খুব স্বাভাবিকভাবেই পার্বত্য পরিষদ স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে। এর সুষ্ঠু পরিচালনা যেমন বিঘ্নিত হবে, এটি যেমন জনসেবায় ব্যর্থ হবে, তেমনি এ পরিষদ ন্যায়ানুগ আচরণেও অভ্যস্ত থাকবে না। আর বাংলাদেশের জাতীয় সরকারের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, এখতিয়ার, হ্রাস করে পার্বত্য পরিষদ তিনটিকে বিশেষ স্টেটাসের দিকে, দায়-দায়িত্বহীনতা ও জবাবদিহিতার দিকে নিয়ে যাওয়াই হবে উপরোক্ত ধূর্ত সংশোধনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — সতেরো

১৯৮৯ সালের আইনের ৬১ নাম্বার ধারায় বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতা রয়েছে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের বা এর চেয়ারম্যানের আদেশের বিরুদ্ধে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আপীল গ্রহণ করা এবং সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার। ৬১ ধারায় আছে ঃ "আপীল।– এই আইন বা কোনো বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে"।

এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৩ ধারা অনুযায়ী বলা হয়েছেঃ "৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ে"র শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে"।

www.pathagar.com

চুক্তির মাধ্যমে এই সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশ সরকারের আর বিন্দুমাত্র অধিকার রইলো না পার্বত্য পরিষদ তিনটির অনাচারী আদেশ সম্পর্কে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আপীল গ্রহণের। তৃতীয় পংক্তির "সরকারের" শব্দটির উচ্ছেদ বাংলাদেশ সরকারের অধিকার ও ক্ষমতা শেষ করে দিচ্ছে আপীল প্রশ্নে। আর আপীল শুনানির অধিকার হারা হওয়ায় সরকারের এমনিতেই পার্বত্য পরিষদের উপর কোনো ক্ষমতা থাকবে না। সেটি রিকনফার্মড্ হয়েছে তৃতীয় পংক্তির ন্যায় চতুর্থ পংক্তিতে "সরকারের" পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" কথাটি প্রতিস্থাপিত হওয়ার ভিতর দিয়ে। আরো লক্ষণীয় যে, পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কে হবেন তা ঠিক করবেন শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব অর্থাৎ সন্তু লারমা। এর মানে হচ্ছে নিয়োগ ক্ষমতা কার্যতঃ তাদের এবং এছাড়া মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী হবেন একজন উপজাতীয়। এমতাবস্থায় সন্তু লারমা নিজে মন্ত্রী হলে তিনি কি পার্বত্য পরিষদের বিরুদ্ধে কিছু শুনবেন? বিশেষতঃ কোনো বাঙালী বা চাকমা ছাড়া অন্য কোনো উপজাতীয় ব্যক্তি বললে শুনবেন কি? ন্যায় বিচার দেবেন কি? আবার সন্তু লারমা যদি আঞ্চলিক পরিষদে থাকেন, সেক্ষেত্রে কল্পরঞ্জন চাকমা বা দীপঙ্কর তালুকদার মন্ত্রী হলে বাস্তবে তাদের কোনো ইচ্ছা বা ক্ষমতা থাকবে কি পার্বত্য জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে আপীল শোনার এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবার? কেননা তারা আপীল শুনে কোনো ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ ও তাদের রিয়েল কনস্টিটুয়েন্সীকে চটিয়ে ন্যায়বিচার করে নিজের পায়ের নিচের মাটি কেন সরাতে যাবেন? কেননা পরের দিনই তো তাদের মন্ত্রীত্ব চলে যাবার নির্দেশ আসবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে। লক্ষণীয় যে, একের পর এক ব্যবস্থা নিয়ে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্ব থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। কেন? পার্বত্য চট্টগ্রামের সবকিছুই যদি এককভাবে উপজাতীয়রা এবং চাকমা-নিয়ন্ত্রিত শান্তিবাহিনী, তাদের নেতৃত্ব, তাদের জেলা পরিষদ, তাদের আঞ্চলিক পরিষদ ও তাদের চিরস্থায়ী দখলভুক্ত মন্ত্রণালয় দ্বারা হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের সাধারণ ক্ষমতাকে হ্রাস করতে করতে একে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বশূন্য করে দেওয়া হয়, তাহলে এর পরিণতি কোন্‌দিকে গড়াবে তা সচেতন দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারছেন। আসলে শান্তিবাহিনীর সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের এই বিষাক্ত চুক্তি নিজেই বলে দিচ্ছে কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ডিসেম্বর রোববার গণভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে বলেছেন যে, "যে চুক্তি হয়েছে তা সব সরকারের জন্যই প্রযোজ্য। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, তাদেরকেই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে" (দৈনিক ভোরের কাগজ, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭) কিন্তু কেন? আপনারা করেছেন বলে? আপনারা ক্ষমতায় আছেন ও চিরস্থায়ীভাবে থাকার বাসনা আছে বলেই? ক্ষমতা সংরক্ষণার্থে ভারতের নির্দেশে শান্তিবাহিনীর মাধ্যমে তাদেরকে সুবিধা দিতে হবে বলেই? এজন্যেই ভারতের 'দি হিন্দু' এবং 'দি হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্রিকা জনসংহতি ও শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সম্পাদিত এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে এবং চুক্তি বিরোধী সমগ্র বাংলাদেশী মানুষকে সমালোচনা

www.pathagar.com

করেছে। (দৈনিক দিনকাল, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭)। চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই এজন্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গুজরাল 'যথার্থ অর্থেই ভারতের ডাকে সাড়া' দেওয়ায় এবং ভারতের কার্যক্রমে যোগ্য সহযোগিতা দেওয়ায় 'এখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আমাদের আর কোনো অভিযোগ নেই' বলে ঘোষণা দিয়েছেন (দ্রষ্টব্য– দৈনিক দিনকাল, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭। দৈনিক মিল্লাত, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭। দৈনিক সংগ্রাম, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর)। খুব স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, পার্বত্য চুক্তি সম্পাদন করে সরকার ভারতকে কি দিয়েছে, কতটুকু দিয়েছে। এ-ও বুঝা গেছে, পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পরপরই সরকার পক্ষের নেতা এবং শান্তিবাহিনীর নেতা— উভয়কেই কেন প্রায় একযোগে দিল্লীতে গিয়ে হাজিরা দিতে হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় এ খবর বেরিয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ আজ এক শ্বাসরুদ্ধকর কারাগারে পরিণত হয়েছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — আঠারো

আবার চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৩ ধারার মাধ্যমে ১৯৮৯ সালের আইনের ৬১ ধারায় মৌলিক বদন এনে 'খ' খণ্ডের ২২ ধারা মারফৎ ১৯৮৯ সালের আইনের ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার মাধ্যমে পার্বত্য জেলা পরিষদের ব্যাপারে বাংলাদেশের জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বিরাটভাবে খর্ব করার যে প্রক্রিয়া জারি করা হয়েছে, সেটিকে প্রাবল্য দিয়ে এবার কেবল সরকারের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া নয়, বরং তাকে ফালতু এবং কার্যতঃ অস্বীকার করা হয়েছে।

তদুপরি উপরোক্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সংবিধান লঙ্ঘনের মাত্রাও স্পষ্ট। সংবিধানের প্রথম ভাগের (প্রজাতন্ত্র) ১ নাম্বার অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "বালাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে"। উপরের বিষয়াদি চুক্তিভুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশ একটি একক রাষ্ট্র (a unitary state) -এই স্বীকৃতি বিনষ্ট হয়েছে। কেননা কার্যতঃ পার্বত্য চুক্তির ইতোমধ্যে উপরে প্রদত্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এর মাধ্যমে পার্বত্য জেলা তিনটিকে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) ৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান' করা হয়নি রাষ্ট্র কর্তৃক। বরং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার কেবল শান্তিবাহিনী-নেতৃত্বাধীন চাকমাদেরই নিরঙ্কুশ জবরদস্তির আসন-সংখ্যাগরিষ্ঠতা চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব তো দূরে থাক, কিছুটা গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়নি। এছাড়া চেয়ারম্যান স্থায়ীভাবে তাদের হওয়ায়, সদস্য বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা হওয়ায়, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একক ও স্থায়ীভাবে তাদের অর্থাৎ চাকমাদের তথা শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির কব্জায় হওয়ায় সংবিধানের ৯ নাম্বার অনুচ্ছেদ সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে এর দাবী ও স্পিরিট গ্রহণ না করে এবং এর

www.pathagar.com

বিকৃত ব্যাখ্যা করে। সংবিধানের ১১ নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের গণতন্ত্র হওয়া, সেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলি এই পার্বত্য চুক্তি দ্বারা চিরস্থায়ীভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। চাকমাদের এবং শান্তিবাহিনীকে খুশী করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে সেখানকার বাঙালীদের এবং ক্ষুদে অন্যান্য উপজাতির প্রতিনিধিত্ব, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার কেড়ে নিয়েছে। এক দলকে ৯ এবং ১১ অনুচ্ছেদের সুবিধা দিতে গিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী ও ক্ষুদে অন্যান্য গোষ্ঠীর একই বিষয়ক পাওনা বানচাল করাটা সংবিধানের এ দুই ধারার বিধানের বাইরে। অগ্রসর চাকমাদের পাওনার বহু বেশি দিয়ে খুশী করতে গিয়ে, পার্বত্য চট্টগ্রামের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত করার কোনো সুযোগ বাংলাদেশ সংবিধানে নেই।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — ঊনিশ

আবার, পার্বত্য চুক্তির উপরে ব্যাখ্যাকৃত বিষয়াদি দ্বারা বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের (নির্বাহী বিভাগ) ৩য় পরিচ্ছেদের (স্থানীয় শাসন) শিরোনামকে একেবারেই করা অস্বীকার করা হয়েছে এবং ৫৯ নাম্বার ও ৬০ নাম্বার অনুচ্ছেদ পুরাপুরি লঙ্ঘন করা হয়েছে। পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে, এর 'খ' খণ্ডের ভিতর দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার ব্যাপারে 'স্থানীয় শাসন' আর 'স্থানীয় সরকার'— এই দুই সাংবিধানিক প্রত্যয়েরই অবসান ঘটানো হয়েছে। ১৯৮৯ সালের আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' বাতিল করে 'পার্বত্য জেলা পরিষদ' করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'স্থানীয় শাসন' প্রত্যয়টি আর 'স্থানীয় সরকার' প্রত্যয়টি তুলে দেবার কোনো সুযোগ নেই। অথচ তা করা হয়েছে সংবিধানের নীতিমূলক ৯ অনুচ্ছেদ এবং আইনগত ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে। 'স্থানীয়' কথাটি তুলে দিয়ে কি স্পেশাল স্টেটাস ও পরিশেষে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াই চালু করা হলো না? ৫৯ ধারার ১ অনুচ্ছেদের 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের' এবং ২ উপ অনুচ্ছেদের 'এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদের আইনের দ্বারা' বিষয়দ্বয় পার্বত্য চুক্তিতে লঙ্ঘন করা হয়েছে বিদ্যমান আইন, নির্বাচনের বিধান, সংবিধান, অন্য আইন, সংসদের আইন ইত্যাদির তোয়াক্কা না করায়। এছাড়া ৫৯(১)এর 'প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার' (Local Government in every administrative unit of the Republic), ৫৯(২) এর 'প্রশাসনিক একাংশের' এবং ৬০ অনুচ্ছেদের 'সংসদ আইনের দ্বারা' আর 'স্থানীয় শাসন'— এক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে। এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে — তাদের বিশাল স্বাধীন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, এখতিয়ারসহ; পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের ও পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের একক চাকমা-নিয়ন্ত্রণের বিবেচনায়; এবং বিপরীতে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় সকল ক্ষমতা

www.pathagar.com

কার্যকরভাবে কেড়ে নেওয়ায় আর বাংলাদেশ সংবিধানের স্থানীয় শাসন বিধানের আওতায় 'প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসন' রূপে দেখার অবকাশ নেই। কেননা সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে "প্রশাসনিক একাংশ"-এর অর্থ জেলা এবং ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে কার্যকর থাকছে না। এদের মর্যাদা এখন সংবিধান প্রদত্ত সীমার বহু বাইরে, বহু উপরে, বহু স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট, বহু বিচ্ছিন্ন এবং সুপ্রা-কন্সটিটিউশনাল। কোর্টে মামলাযোগ্য এ বিষয়গুলি।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — কুড়ি

আবার সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের আইনগত সমতা ও সম আশ্রয় লাভ এবং ২৮(১) অনুচ্ছেদের বৈষম্য না করার বিধান এক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে। ২৮(৪) অনুচ্ছেদের 'অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের' বিষয়টির বাস্তব-উল্টে-ধরা বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ২৮(৪) অনুচ্ছেদের সুবিধা অগ্রসর চাকমারা নয়, বরং সেখানকার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী ও অন্যান্য চাকমা-নিগৃহীত ক্ষুদে উপজাতিগুলি পাওয়ার কথা। ২৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা' এবং ২৯(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা — এই উভয়টিই পার্বত্য চুক্তিতে লঙ্ঘিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ২৯(৩) ধারার বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। পার্বত্য চুক্তিতে সংবিধানের ৩২, ৩৬, ৪২ অনুচ্ছেদগুলির লঙ্ঘন ঘটানোর ফলে 'অউপজাতীয়' সংজ্ঞার ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যার সুযোগ নিয়ে কার্যতঃ এই তিন অধিকারতো বটেই, সেই সঙ্গে ৯ নং ১১ অনুচ্ছেদের নীতি এবং ২৭, ২৮, ২৯ অনুচ্ছেদের মৌলিক অধিকার এবং ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের দাবীও লঙ ঘন করা হচ্ছে। চুক্তির মাধ্যমে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে রীট করা এবং স্থানীয় শাসন আইন লঙ্ঘন করার দায়ে মামলা করার সুযোগ এজন্যে নিশ্চিতভাবে রয়েছে। এছাড়া সংবিধানের কোর্টে নন-এনফোর্সেবল ৯ এবং ১১ অনুচ্ছেদের মূলনীতি লঙঘনের দায়ও সরকারের এবং ঐ সম্পাদিত চুক্তির অগ্রহণযোগ্যতাও সেজন্যে স্পষ্ট। সংবিধানের ১ নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের 'একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম' সত্তাও এই চুক্তির মাধ্যমে লঙ্ঘিত হয়েছে। এজন্যেও কোর্টে যাওয়া চলে। সবচেয়ে বড় বিষয় — সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ', সংবিধানের অধীনেই কেবল ক্ষমতার প্রয়োগ এবং ৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে সংবিধান', সংবিধানের সঙ্গে অসমঞ্জস আইন বাতিল হবে — এসব কিছু এখানে একেবারেই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে স্বেচ্ছাচারীভাবে উল্লিখিত বিষয়াদি লঙ্ঘন করে একতরফা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক তা বলবৎ করায়। এক্ষেত্রেও সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে বিচার দাবী করা যায়।

www.pathagar.com

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — একুশ

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৬২ ধারা অনুযায়ী বলা হয়েছেঃ "জেলা পুলিশ। — (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও তন্নিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে"।

১৯৮৯ সালের আইনের ৬২(১) ধারা অনুযায়ী পুলিশ নিয়োগ সংক্রান্ত অধিকার এযাবৎ বাস্তবায়িত হয়নি আইন, পদ্ধতি ও নিয়ন্ত্রণগত জটিলতা এবং বাস্তব সমস্যা বিবেচনায়। এছাড়া ৬২(১) ধারায় এযাবৎ পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও তন্নিম্ন স্তরের সকল সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা ছিল জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের। এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৪ ধারার (ক) উপধারা মোতাবেক মূল ৬২ ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করা হচ্ছে। কেবল "সহকারী" শব্দটি বাদ দিয়ে দেওয়ায় এবার থেকে পুলিশের সহকারী নয়, বরং সাব-ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে সকল নিয়োগ দেবে পার্বত্য পরিষদ তিনটি। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান– এই তিন পরিষদের নিজ নিজ নিয়োগকৃত পুলিশ থাকবে এবং সাব-ইন্সেপেক্টর থেকে শুরু করে সকল নিয়োগ তারাই দেবে। বাংলাদেশের ৬১টি জেলায় একই নিয়োগ পদ্ধতিতে জাতীয় সরকার দেবে পুলিশ নিয়োগ, আর কেবল পার্বত্য তিন জেলায় তাদের নিজেদের নিয়োগকৃত পুলিশ। এক দেশে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই ব্যবস্থা। সংবিধানের ৫৯, ৬০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসনের এই অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া আছে কি? আর কেবল তিন জেলার বা এক অঞ্চলের জন্যে এটি করা যায় কি? আবার, শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী খুনীদের অস্ত্র সমর্পণের মহড়া দেখিয়ে (সব জমা দেবে না, এখন দেবে না, চুক্তির পুরো বাস্তবায়ন দেখে দেবে — এসব শর্ত এখন জুড়ে দিচ্ছে শান্তিবাহিনী। কল্পরঞ্জন চাকমা শাসক দলের এম. পি. হয়েও, চুক্তিতে সরকারপক্ষ হয়েও 'আজকের কাগজ'-এ ০৬/১২/৯৭ তারিখে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন যে, শান্তিবাহিনী এখন অস্ত্র জমা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। চুক্তির পুরো বাস্তবায়ন না দেখা পর্যন্ত তারা অস্ত্র সর্ম্পণ করবে না। তাহলে চুক্তির ৪৫ দিনের শর্ত কোথায় গেল?) শান্তিবাহিনী-নিয়ন্ত্রিত জেলা পরিষদে যদি খুনী-সন্ত্রাসী ক্যাডারদের পুলিশের কর্মকর্তা ও কনস্টেবল করে দেওয়া হয়, তাহলে আইন-শৃঙ্খলার কি অবস্থা দাঁড়াবে, আর বাঙালীদেরই বা কি হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

আবার ১৯৮৯ সালের আইনে শর্ত আছে পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অউপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার

www.pathagar.com

সংখ্যানুপাত বজায় রাখার কথা। কিন্তু এখন 'খ' খণ্ডের 'অ-উপজাতীয়' চিহ্নিতকরণ ও সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টির কারণে বাঙালীরা, তাদের প্রার্থীরা সার্টিফিকেট লাভে ব্যর্থ হয়ে তথায় পুলিশে যেতে পারবে না। আবার পার্বত্য চুক্তিতে 'তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে'– এটির অন্তর্ভুক্তির ফলে পার্বত্য জনগণের প্রায় ৫০% ভাগ বাঙালী তাদের ন্যায্য অধিকার ও দাবী থেকে বঞ্চিত হবে। এক্ষেত্রে সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এছাড়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বা প্রায় পুরো উপজাতীয় এবং বিশেষতঃ চাকমা পুলিশ বাহিনী বাস্তবে কাজ শুরু করলে তথায় বাঙালীদের অস্তিত্ব বিক্ষুপ্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেবে। এ পথেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙালীশূন্য করে শান্তিবাহিনী একে বিচ্ছিন্ন করবে। আরো স্বাভাবিক এটি যে, শান্তিবাহিনী এযাবৎ তাদের সাথে থাকা অস্ত্র চালনায় প্রশিক্ষিত চাকমাদেরই পুলিশের চাকরীতে প্রেফার করবে।

আবার ১৯৮৯ সালের স্থানীয় আইনের আওতায় ৬২ ধারার উপধারা অনুযায়ী জেলা পুলিশ কাজ করার কথা 'আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে পরিষদের নিকট দায়ী' — এই ভিত্তিতে। কিন্তু এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৪ ধারার (খ) ধারায় পূর্ববর্তী ৬২ নাম্বার ধারার উপধারা (৩)-এর দ্বিতীয় পংক্তির উল্লিখিত শর্তটি বাতিল করে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" পুলিশের দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করায় একদিকে পার্বত্য তিন জেলার পুলিশের উপর বাংলাদেশ সরকারের, এর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ যেমন অকার্যকর হয়ে পড়ছে, তেমনি অন্যদিকে পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ার ও ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে। কেন সকল ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারকে হটিয়ে পার্বত্য তিন পরিষদের কর্তৃত্ব মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে? এসব তো দেশের অপর ৬১টি জেলা পাচ্ছে না। তবে কেন কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামে? এসব কি আইন ও সংবিধানসম্মত? পার্বত্য চট্টগ্রাম কি জাতীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন কর্তৃত্ব গড়ে তুলতে যাচ্ছে?

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — বাইশ

পার্বত্য চুক্তি 'খ' খণ্ডের ২৬ নাম্বার ধারায় ১৯৮৯ সালের আইনের ৬৪ নাম্বার ধারার ব্যাপক সংশোধন আনা হয়েছে। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের এখতিয়ার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, ইচ্ছা, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের প্রাধিকার একেবারে লোপ পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীন ইচ্ছা, পার্বত্য ভূমির উপর তার সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয়েছে।

১৯৮৯ সালের আইনে এরশাদ সরকার পার্বত্য ভূমির হস্তান্তরে বিরাট বাধা-নিষেধ তৈরি করে সরকারের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করে দেয় এবং খুবই উল্লেখযোগ্যভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে দেয়। যদিও ভূমি বিষয়ক এই বিশেষ বিধান নানা

www.pathagar.com

জটিলতার কারণে পুরো বাস্তবায়িত হয়নি, তবে এর আইনগত সূত্র ১৯৮৯ সালের আইনে তৈরী হয়। তথাপি ১৯৮৯ সালের আইনে যা বলা হয়েছে, তা নিম্নরূপঃ

"ভূমি হস্তান্তরে বাধানিষেধ। — আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, (রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না এবং অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন জায়গা-জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নহেন এইরূপ ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে সংরক্ষিত (Protected) ও রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তকৃত জায়গা-জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন জায়গা-জমি বা বনের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না"।

বিপরীত অবস্থানে নিয়ে বর্তমান পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৬ ধারায় ১৯৮৯ সালের উপরে উদ্ধৃত ৬৪ নাম্বার ধারাকে সংশোধন করে নিম্নরূপ করা হয়েছেঃ

"(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি (Fringe Land) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে"।

ভূমি প্রশ্নে ১৯৮৯ সালের আইনেই মাত্রাধিক কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল পার্বত্য তিন জেলা পরিষদকে। তথাপি ১৯৮৯ সালের আইনের সঙ্গে ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭-এ আওয়ামী লীগ সরকার শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির সাথে যে চুক্তি করেছে সেই চুক্তির ভূমি প্রসঙ্গে সংশোধিত বিধানের তুলনামূলক আলোচনা যে কাউকে আতঙ্কিত করবে।

www.pathagar.com

কেননা ১৯৮৯ সালের আইনে পার্বত্য এলাকার জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত বন্দোবস্তু না দেওয়া এবং অনুরূপ জায়গা জমি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা যাবে না — এই বিধান রাখা হয়েছে। আর এবার পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৬ ধারায় ১৯৮৯ সালের আইনের ৬৪ ধারা পুরো সংশোধন করে ক, খ, গ, ঘ — এই চারটি উপধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। আগে কেবল জায়গা-জমি বাইরের কাউকে পূর্বানুমোদন ছাড়া বন্দোবস্ত না দেওয়ার আইন করা হয়েছে। আর এবার "বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ কোনো জায়গা-জমি" পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কেবল হস্তান্তর নয়, সেই সঙ্গে "ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না"। অর্থাৎ একদিকে তিন জেলাসহ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির উপর জাতীয় সরকারের, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা একেবারেই লুপ্ত হলো এবং অন্যদিকে উপজাতির নামে শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির কর্তৃত্ব নজীরবিহীনভাবে বাড়লো। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূখণ্ডের একটি বিশেষ স্বাধীন সত্তা দাঁড়িয়ে গেল।

আবার, ১৯৮৯ সালের আইনে সংরক্ষিত (Protected) ও রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চলসহ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ "সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তকৃত জায়গা-জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কেননা জায়গা-জমি বা বনের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোগ্য হইবে না" বলে ঘোষণা দিয়ে সরকারের বেশ কিছুটা কর্তৃত্ব রাখা হয়েছিল। আর এবার সংরক্ষিত (Protected) বনাঞ্চলে সরকারী কর্তৃত্ব কেড়ে নেওয়া হল এবং গুরুত্বপুর্ণ স্থাপনা বাদে কেবল "সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না" বলে ঘোষণা দেওয়া হলো। এর ফলে সরকার বা জনস্বার্থে বন্দোবস্তকৃত জমির ব্যাপারে সরকারী এখতিয়ার বিসর্জন দেওয়া হল। আর "রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন জায়গা-জমি বা বনের ক্ষেত্রে" অধিগ্রহণ, বন্দোবস্ত, হস্তান্তরের সামান্যতম ক্ষমতা সরকারের থাকলো না। এগুলি সব গেল পার্ব্যত্য জেলা পরিষদ তিনটির ক্ষমতা সীমায়।

এরপর পার্বত্য চুক্তির "খ" খণ্ডের ২৬ ধারার খ-উপধারা অন্তর্ভুক্ত করে কার্যতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা পরিষদের আওতাধীন ভূখণ্ড থেকে জাতীয় সরকারকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বের করা হলো। সরকার নিজের ভূখণ্ড, তিন পার্বত্য পরিষদের, যেটি প্রাসঙ্গিক তার সঙ্গে, আলাপ না করে এবং এর সম্মতি ব্যতিরেকে অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করতে পারবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেশের অন্যান্য জেলার ভূমি প্রশ্নে ডেপুটি কমিশনারের যে কর্তৃত্ব, তা এবং পার্বত্য তিন জেলা পরিষদ চুক্তির মাধ্যমে যা পেলো, তা মোটেও সমান নয়। যারা এ ব্যবস্থা অন্যান্য জেলার ডিসির এখতিয়ারের সঙ্গে তুলনা করছেন, তারা ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। ডিসি ৬১টি জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০% নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি। তার নিজের একক কর্তৃত্বে জাতীয় সরকারের ইচ্ছার বাইরে

www.pathagar.com

কিছুই করার নেই। আর এদিকে তিন পার্বত্য পরিষদ এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং বিকৃত ব্যাখ্যা করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবে না।

আবার পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৬ ধারার গ-উপধারা অনুযায়ী ভূমি ব্যবস্থাপনার ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করবে পার্বত্য তিন পরিষদ। এ ব্যবস্থা ১৯৮৯ সালের আইনে ছিল না। পার্বত্য চুক্তির ভূমি সংক্রান্ত বিধান দ্বারা বাংলাদেশ সংবিধানের একাদশ ভাগের (বিবিধ) ১৪৩ অনুচ্ছেদ-এর ১ উপ-অনুচ্ছেদের ক, খ, গ লঙ্ঘন করে প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি বিষয়ে স্বীয় অধিকার, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিনষ্ট করলো সরকার।

এছাড়া পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৬ ধারার 'ঘ' উপধারা অনুযায়ী কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি (Fringe Land) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এখন এই ব্যবস্থার দ্বারা একচেটিয়াভাবে উপজাতীয়রা সুবিধা নেবে। পরিষদ ক্ষমতা চর্চা করবে, দুর্নীতিও হবে। কাপ্তাই প্রজেক্টের কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারা এক দফা ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। আবার এদের মধ্যে অনেকে এখানকার জায়গা-জমি বেচে ভারতে চলে গেছে ১৯৭১ সালের পূর্বে। তারা ভারতীয় নাগরিক। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭১ সালের পূর্বে ভারতে চলে-যাওয়া লোকদের দায়িত্ব বাংলাদেশ নেবে না। তাই যদি এখন তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হয় কিংবা 'মূল মালিকদের' ছুতায় ভারতীয় চাকমা এখানে আনার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সমস্যা আরো মারাত্মক রূপ নেবে।

মোট কথা, পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৬ নাম্বার ধারা মোতাবেক ১৯৮৯ সালের আইনের ভূমি সংক্রান্ত ধারা আমূল বদলে দিয়ে সংশোধনী করায় ও চুক্তি বলবৎ-এর ঘোষণা দেওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব কার্যতঃ হারিয়েছে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার সলিড গ্রাউন্ড তৈরি করে দেওয়া হল। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার দেশের এক-দশমাংশ সর্বাধিক সম্পদশালী ও ভূ-কৌশলগত গুরুত্বের অধিকারী অখণ্ড ভূখণ্ড বাংলাদেশের হাতছাড়া করলো। বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের (বিচার বিভাগ) ১০২ অনুচ্ছেদের (১) ও (২) উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারসমূহের যে কোনোটির বাস্তবায়নের জন্যে যেমন চুক্তি-প্রসঙ্গে আজ হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট করতে পারে, তেমনি পার্বত্য চুক্তির উল্লিখিত ঘোরতর আপত্তিকর বিষয়গুলি তুলে ধরে বাংলাদেশ সংবিধানের একাদশ ভাগের (বিবিধ) চুক্তি ও দলিল বিষয়ক ১৪৫ অনুচ্ছেদের ২ উপ-অনুচ্ছেদের তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তির ঘোষণা মোতাবেক আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এখানে বলা হয়েছে ঃ "তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না"।

www.pathagar.com

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — তেইশ

১৯৮৯ সালের আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কিত বিশেষ বিধান করা হয়েছে। ঐ আইনের ৬৫ ধারায় বলা হয়েছে ঃ "আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের উপর অর্পণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা জেলায় আদায়কৃত উক্ত করের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ পরিষদের তহবিলে অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে"।

লক্ষণীয় যে, ১৯৮৯ সালের আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কিত বেশ কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যেও বাংলাদেশ সরকারের যথেষ্ট ন্যায্য কর্তৃত্ব ছিল। যেমন, (১) গেজেট প্রজ্ঞাপন দেবে সরকার; (২) জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের উপর যদি অর্পিত হয়, তা হবে সরকারের ইচ্ছায়; (৩) জেলায় আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর কেবল সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারাই কোথায় কতটুকু জমা হবে, তা স্থির করা হবে, (৪) আবার আদায়কৃত করের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ কেবল সরকারের ইচ্ছাতেই পরিষদের তহবিলে যেতে পারবে; এবং (৫) আদায়কৃত করের যতটুকু জেলা পরিষদের তহবিলে যাবে, তা হবে সরকারের তরফ থেকে পরিষদের জন্য অনুদান (grant) মাত্র। অর্থাৎ ভূমি সংক্রান্ত করের আদায় ও ব্যবহার বিধানে এই পাঁচ ক্ষেত্রেই সরকারের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব রয়েছে ১৯৮৯ সালের আইন মোতাবেক।

কিন্তু এখন সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী এর 'খ' খণ্ডের ২৭ নাম্বার ধারায় ১৯৮৯ সালের আইনের ৬৫ নাম্বার ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে নতুন ধারা প্রণয়ন করা হয়েছে ঃ

"আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে"।

পার্বত্য চুক্তির উল্লিখিত সংশোধিত নতুন ধারা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ১৯৮৯ সালের আইনের ৬৫ ধারায় পূর্বে বিশ্লেষিত পাঁচটি ক্ষেত্রে সরকারের যে প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব তা সম্পূর্ণ বাতিল করে, পার্বত্য তিন জেলার ভূমি কর আদায়, জমা ও ব্যবহার প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থানকে একেবারেই অস্তিত্বহীন করা হয়েছে। সরকারের আর সামান্য কোনো ক্ষমতা থাকছে না পার্বত্য তিন জেলার ভূমি করের যাবতীয় বিষয়ে। খুবই স্পষ্টভাবে বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ ভাগের (নির্বাহী বিভাগ) ৩য় পরিচ্ছেদের (স্থানীয় শাসন) ৫৯ অনুচ্ছেদের ১ ও ২ উপ-অনুচ্ছেদকে বাস্তবায়ন তথা 'প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনভার' সফল করার জন্যে ৬০ অনুচ্ছেদে 'সংসদের আইন দ্বারা' 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে' কর আরোপ, বাজেট প্রস্তুত, নিজস্ব তহবিলের যে বিধান করা হয়েছে তা ব্যর্থ করে দেওয়া

www.pathagar.com

হলো। এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৭ ধারা মোতাবেক ১৯৮৯ সালের আইনের ৬৫ ধারার আমূল সংশোধনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'স্থানীয় শাসন', 'প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনভার' 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান', 'স্থানীয় প্রয়োজন' ইত্যাদি সাংবিধানিক প্রত্যয়ের অবসান ঘটেছে। সোজাসুজি বলে দেওয়া হয়েছে– (১) ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হাতে থাকবে, এবং (২) জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে। এর ফলে পার্বত্য তিন জেলায় ভূমি কর প্রশ্নে সংবিধানের ৬০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'সংসদের আইন দ্বারা' কর আরোপ, আদায়, বাজেট, তহবিলে জমা ইত্যাদির সুযোগ রইলো না। সংবিধানে প্রদত্ত জাতীয় সংসদের মৌলিক এখতিয়ার ও কর্তৃত্ব বিনষ্ট হলো আইন প্রণয়ন প্রশ্নে। সংবিধানের একাদশ ভাগের (বিবিধ) ১৫২ নাম্বার অনুচ্ছেদে (ব্যাখ্যা বা Interpretation) "রাষ্ট্র" বলিতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত। এই মৌল ধারাটি পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৭ ধারায় সন্নিবেশিত ১৯৮৯ সালের আইনের সংশোধিত ৬৫ ধারা দ্বারা অবলুপ্ত হলো। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি কর প্রশ্নে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ কারো কোনো স্বীকৃতি নেই, সেহেতু কার্যতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ "রাষ্ট্র" অস্তিত্বশূন্য হয়ে পড়ছে এবং সেখানকার উপর এর সার্বভৌম কর্তৃত্বও বিলুপ্ত হচ্ছে। আবার পার্বত্য চুক্তির উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা পার্বত্য তিন জেলায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের একক ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব পার্বত্য পরিষদ তিনটি পাওয়ায় এবং আদায়কৃত কর সম্পর্কে জাতীয় সংসদের আইন, সংবিধান, আপাততঃ বিদ্যমান আইনসমূহ ও জাতীয় সরকারের একেবারেই তোয়াক্কা না রেখে কেবল সম্পূর্ণভাবেই পরিষদের স্বতন্ত্র তহবিলে জমা দেওয়ার স্বেচ্ছাচারী বিধান করায় ও চুক্তি বলবৎ বলে ঘোষণা দেওয়ায় সংবিধানের পঞ্চম ভাগের (আইন সভা) ২য় পরিচ্ছদের (আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি) ৮৪ অনুচ্ছেদের ১ এবং ২ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংযুক্ত তহবিল (Consolidated Fund) ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব (Public Account of the Republic) সংক্রান্ত বিধান লংঘিত হয়েছে।

সংবিধানের ৮৪ অনুচ্ছেদের ১ উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ "সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোন ঋণ পরিশোধ হইতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ একটিমাত্র তহবিলের অংশে পরিণত হইবে এবং তাহা "সংযুক্ত তহবিলে" নামে অভিহিত হইবে"।

৮৪ অনুচ্ছেদের ২ উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ "সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারী অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে"।

সংবিধানের ৮৪ অনুচ্ছেদের ১ ও ২ উভয় উপ-অনুচ্ছেদ এখানে অকার্যকর করা হয়েছে 'সংযুক্ত তহবিল' ও 'প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব' প্রত্যয় দু'টিকে লঙ্ঘন করে। সেই সঙ্গে সংবিধানের ৫৯ (১ ও ২) অনুচ্ছেদ এর 'স্থানীয় শাসন' ও 'প্রশাসনিক একাংশ'-এর ধারণাকে লঙ্ঘন করায় ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্যে ৬০

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদের 'কার্যকরতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদের আইন দ্বারা' 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ' করার বিধানও লঙ্ঘিত হয়েছে। তাছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই সংসদের আইনের দ্বারা বিষয়টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। এদ্ব্যতীত, উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা সংবিধানের ৮৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ (Regulation of public moneys)-এর বিধানও লংঘিত হয়েছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — চব্বিশ

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৬৭ নাম্বার ধারা ছিল নিম্নরূপ ঃ "পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সম্পর্কে আদেশ।– সরকার, প্রয়োজন হইলে আদেশ দ্বারা পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে কাজের সমন্বয়ের বিধান করিতে পারিবে"। বর্তমান পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৮ ধারায় ১৯৮৯ সালের ৬৭ নাম্বার ধারা সংশোধন করে বলা হয়েছে ঃ "পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে"।

এক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায় হলো, তা দেখা দরকার। (১) ১৯৮৯ সালের আইন অনুযায়ী পরিষদের ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় করার জন্যে ইন্সট্রুমেন্ট হচ্ছে সরকারের আদেশ; (২) সরকারের কাছে প্রয়োজন অনুভূত হবার শর্ত এখানে রয়েছে; (৩) সেক্ষেত্রে আদেশ দেবার মালিক কেবল সরকার; এবং (৪) পরিষদ ও সরকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে আদেশ দ্বারা 'কাজের সমন্বয়ের বিধান'ও করবে সরকার। অর্থাৎ প্রচুর ছাড় সত্ত্বেও ১৯৮৯ সালের আইনের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সরকারের রয়েছে প্রাধান্যশীল, একক ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব।

কিন্তু বর্তমান পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক এর 'খ' খণ্ডের ২৮ ধারা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের ৬৭ নাম্বার ধারা সংশোধন করায় যা দাঁড়াচ্ছে, তা নিম্নরূপ ঃ (১) এখন থেকে পরিষদ ও সরকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে কিনা, তা নির্ধারণ করার এখতিয়ার কেবল সরকারের নয়, একইভাবে সমতালে ও সম মানে তা পরিষদেরও এখতিয়ার; (২) কেবল সরকারই বিষয়টি উত্থাপনের মালিক নয়, বরং সেই সঙ্গে পরিষদও একই ক্ষমতার অধিকারী; (৩) সরকার সমন্বয়ের বিষয় উত্থাপন না করলেও পরিষদ সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করলেই তা যথেষ্ট হবে ও উত্থাপনযোগ্য হবে; (৪) এখন থেকে সরকার আদেশ দ্বারা পরিষদ ও সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের বিধান করতে পারবে না, বরং তা হবে 'পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে'।

www.pathagar.com

তাহলে অবস্থা কি দাঁড়ালো? পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক, এর 'খ' খণ্ডের ২৮ ধারার সংশোধিত বিধানানুযায়ী পার্বত্য তিন জেলার জেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার পরিষদ এখন 'স্থানীয় শাসন' প্রত্যয়টিও পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিশেষ মর্যাদা (special status) পেয়েছে। ওই তিন পরিষদের অবস্থান, এখতিয়ার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও মর্যাদা এখন বিশাল। পার্বত্য পরিষদ তিনটি বাংলাদেশ জাতীয় সরকারের সম মর্যাদা (equal status) পাচ্ছে। তারা দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে on the same plane-এ। সম অবস্থান ও সমক্ষমতাশীল স্বাধীন দু'টি কর্তৃত্ব এর ফলে এসে যাচ্ছে। এ যেন সমান দুই স্বাধীন প্রশাসন ব্যবস্থা চালু আছে। প্যারালাল প্রশাসন যেন বা চালু হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। সংবিধানের ১ অনুচ্ছেদের "বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র"–এই বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন দুই ধরনের কর্তৃপক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা একই মর্যাদাসম্পন্ন এবং পার্বত্য পরিষদ তিনটি বহু ক্ষেত্রেই একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক। এ ধরনের অবস্থা রাষ্ট্রের এককত্ব (oneness)-কে বিনষ্ট করছে। এটি এক দেশে দুই বিধান — পুরো দেশে এক বিধান এবং পার্বত্য তিন জেলায় স্বতন্ত্র বিধান, এ অবস্থার প্রামাণ্য নজীর। এক দেশের মধ্যে আরেক দেশ দেখা দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এ পথেই বিচ্ছিন্নতার দিকে যাচ্ছে। সময়ে এ সত্য প্রমাণিত হবে। পার্বত্য চুক্তি বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের সাংবিধানিক কর্তৃত্ব ও সরকারী নিয়ন্ত্রণকে বিনষ্ট করেছে। এই চুক্তি তথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটাবে। দেশের বিপক্ষে এত বড় অপরাধ দ্বিতীয়টি হতে পারে না। এ কারণেই 'জাতীয় স্বার্থবিরোধী কালো চুক্তি' রক্ষা ও বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনীর হুমকী, 'সশস্ত্র মহড়া' অপহরণ বেড়ে গেছে; সরকারী সংগঠন, সরকারী ছাত্র সংগঠন ও পেটোয়া বাহিনীর 'নারকীয় তাণ্ডব' (দৈনিক ইনকিলাব, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭) নতুন করে চালু হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রচারযন্ত্রে ও গণমাধ্যমে চলছে নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যাচার। ওদিকে আতঙ্কিত, ক্ষুব্ধ বাংলাভাষী মুসলমানরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বত্র মিছিল, সমাবেশ আরো কালো পতাকা। অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে 'কাফনের কাপড় পরে শত শত যুবক মায়েদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে' (দৈনিক ইনকিলাব, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭)।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — পঁচিশ

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৬৮ ধারায় বাংলাদেশ সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। ৬৮ ধারার ১ উপধারায় বলা হয়েছে ঃ "এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে"।

এবার পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৯ ধারা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের আইনের ৬৮ ধারায় নাম্বার ধারার ১ উপ-ধারা সংশোধন করে বলা হয়েছে ঃ "এই আইনের উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে"।

এক্ষেত্রে পার্থক্যটুকু তুলে ধরা হচ্ছে। ১৯৮৯ সালের আইনানুযায়ী ঐ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার সরকারের। কিন্তু এবার সে অধিকার বাতিল করা হলো। এখন বিধি প্রণয়ন করতে গেলে পূর্বেই তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমেই কেবল সরকার বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। অর্থাৎ তারা রাযী না হলে, ভিন্নমত দিলে সরকারের বিধি প্রণয়নের কোনো সুযোগ থাকবে না। আবার "কোনো বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে' বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, কখনো সরকার পরিষদের সাথে পূর্ব-আলোচনায় সম্মতি পেয়ে বিধি প্রণয়ন করলেও তা পুনর্বিবেচনার্থে সরকারের নিকট আবেদন করার বিশেষ অধিকার পার্বত্য জেলা পরিষদ তিনটিকে দিয়ে সরকারের কেড়ে-নেওয়া ক্ষমতাশূন্য অবস্থার মাঝেও যেটুকু মর্যাদা-কর্তৃত্ব অবশিষ্ট ছিল, তাও বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে–একই দেশের জেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে একক জাতীয় সরকারের এজেন্ট কিভাবে এত বিশেষ অবস্থান নিচ্ছে, এখতিয়ার পাচ্ছে, ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করছে, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে? বাংলাদেশের এককত্ব আসলে লুপ্ত হচ্ছে, প্যারালাল কর্তৃত্ব দাঁড়াচ্ছে। বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতা ঘোষণাই হবে এর পরিণতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে বিশেষ অবস্থা দিয়ে একটি কনফেডারেল স্ট্রাকচারই শেষাবধি দাঁড়াচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে তিনটি অতি ক্ষমতাশালী অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে। প্রতিরোধ না করলে, চুক্তি বাতিল না করলে অবশ্যম্ভাবীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের হাতছাড়া হবে এবং সেখানে ভারতের কর্তৃত্ব শেষাবধি প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী খ্রীস্টশক্তিও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে লিপ্সায় নিমজ্জিত।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — ছাব্বিশ

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৬৯ ধারার ১ উপধারায় বলা হয়েছে ঃ "এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের বা কোন বিধির বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে"।

অর্থাৎ ১৯৮৯ সালের আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদ তিনটি সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমেই কেবল প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারতো। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এরূপ প্রণীত প্রবিধান কোনো অবস্থাতেই ১৯৮৯ এর আইন বা কোনো বিধি-বিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারবে না।

www.pathagar.com

কিন্তু ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭-এ স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩০ (ক) ধারায় ১৯৮৯ সালের আইনের ৬৯ ধারার ১ উপধারায় "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও জাতীয় সরকারের অধিকার, এখতিয়ার, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা লুপ্ত করা হলো। এখন পার্বত্য তিন পরিষদ নিজেদের একক সিদ্ধান্তে ও ক্ষমতায় প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, এবং সরকারকে বিন্দুমাত্র না জানিয়ে ও জিজ্ঞাসা না করেই। সরকার এরূপ প্রণীত প্রবিধান বাতিল করার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না। তবে কোনো প্রণীত প্রবিধানের কোনো অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে"।

লক্ষণীয়, আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতির শান্তিবাহিনী বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছে। সরকার শান্তিবাহিনীর কাছে একেবারে লজ্জাজনকভাবে নতজানু হয়েছে এক্ষেত্রে। কেননা উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রবিধান জারী করবে তিনটি জেলা পরিষদ কেবল তাদের একক ইচ্ছাতে। সরকার সেক্ষেত্রে কিছুই বলতে পারবে না। আপত্তিকর হলেও কোনো প্রবিধান বাতিল করতে পারবে না। সরকার মতভিন্নতা প্রকাশ করলে কেবল প্রণীত কোনো প্রবিধানের কোনো অংশ সংশোধনের পরামর্শ দিতে পারবে বা অনুশাসন করতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, যদি শান্তিবাহিনী-নিয়ন্ত্রিত, চাকমাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্বাধীন পার্বত্য তিন জেলা তাদের ব্যাপারে ক্ষমতাহীন সরকারের পরামর্শ না শোনে, সরকারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে গ্রাহ্য না করে, যদি তারা সরকারের অনুশাসন না মানে, তাহলে তিন পার্বত্য জেলার বিচ্ছিন্নবাদী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো শক্তিই সরকারের নেই। বিদেশী সহায়তাপুষ্ট সন্ত্রাসী শক্তির কাছে মাথানত করে দেশের পায়ে; রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর; জাতীয় সরকারের ক্ষমতা, এখতিয়ার, কর্তৃত্ব, মর্যাদার উপর এমন কুড়াল মারার কাজ কোনো স্বাধীন সরকার করতে পারে না। এ কাজ করতে পারে কেবল বিদেশের স্বার্থে এবং কেবল যে-কোনো মূল্যে স্বীয় গদী রক্ষার্থে উন্মাদ হয়ে ওঠা কোনো দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, স্বাধীনতার শত্রু কোনো কর্তৃপক্ষ। যে-কোন অবস্থায় এই চুক্তি বাতিল করতে হবে এবং পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে অজ্ঞ, অশিক্ষিত সরকারী প্রতিনিধির দেশ ধ্বংসকারী অর্বাচীন কর্মকাণ্ড। প্রধানমন্ত্রী সর্বদল, সর্বমতের এবং বিশেষতঃ যোগ্য বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগিয়ে এই চুক্তি গভীরভাবে পাঠ ও মতামত দিতে বললে ভাল করবেন। প্রেসিডেন্টও ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নিতে পারেন। মনে রাখবেন, চুক্তি এ অবস্থায় থাকলে দেশ যাবে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব যাবে।

পার্বত্য চুক্তির' 'খ' খণ্ডের ৩০ ধারার খ-উপধারায় আরেকটি বদল করা হয়েছে। বিদ্যমান ১৯৮৯ সালের ৬৯ নাম্বার ধারার ২ উপধারার (জ) শর্ত মোতাবেক "পরিষদের কোনো কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ" বিষয়ক যে ব্যবস্থা ছিল, এখন এই শর্তটি অবলুপ্ত করা হল। অর্থাৎ এখন থেকে পরিষদের কোনো কর্মকর্তার হাতে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা যাবে না। যদিও পরিষদের কর্মকর্তা উপজাতীয় হবে এখন থেকে,

www.pathagar.com

তথাপি সরকারী কাউকে বিন্দুমাত্র কর্তৃত্বে না রেখে টোটাল কন্ট্রোল শান্তিবাহিনীর হাতে রাখাই এর উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমেও সরকারের সামান্যতম পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণও বিনষ্ট হলো।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — সাতাশ

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৭০ ধারায় পার্বত্য তিন জেলা পরিষদের উপর বাংলাদেশ সরকারের এক দৃঢ় ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনে হস্তক্ষেপের বিধান ছিল। ৭০ ধারায় বলা হয়েছিল ঃ "সরকার এই আইনের অধীন ইহার সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে"।

এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩১ ধারা অনুযায়ী সরকারের উপরোক্ত সর্বময় ক্ষমতা শতকরা ১০০% কেড়ে নেওয়া হলো। সরকারকে ক্ষমতা প্রদানকারী ঐ ধারাটিই সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া হলো। পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩১ ধারাতে সরাসরি বলে দেওয়া হলো ঃ "৭০ ধারা বিলুপ্ত করা হইবে"।

আরো বহু সংখ্যক ক্ষেত্রসহ এক্ষেত্রে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য তিন জেলা পরিষদের ব্যাপারে সরকার একেবারেই ক্ষমতাশূন্য হয়ে পড়লো। অথচ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলছেন "বিএনপি তাজা টাটকা মিথ্যা কিছু দফা তুলে জাতিকে বিভ্রান্ত করছে" (সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে শেখ হাসিনা। দ্রষ্টব্য ঃ বাংলাবাজার, ০৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭)। আরো বলা হয়েছে, সরকারের ক্ষমতা, প্রশাসনের কর্তৃত্ব নাকি কোথাও খর্ব করা হয়নি। সবই বিএনপি ও চুক্তি বিরোধীদের 'সর্বৈব মিথ্যাচার ও অপপ্রচার'। 'চুক্তির কোথাও এমন কথার উল্লেখ নেই'। সবই নাকি 'উদ্ভট, কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ'; (দ্রষ্টব্য– খালেদার ১৮ দফা আপত্তির জবাবে শেখ হাসিনার ব্যাখ্যা, সংবাদ, ০৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭, বাংলাবাজার পত্রিকা, ০৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭, ভোরের কাগজ, ০৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭)।

এখন বাস্তবে যে কে বা কারা তাজা টাটকা মিথ্যা বলছেন; সর্বৈব মিথ্যাচার ও অপপ্রচার চালাচ্ছেন; উদ্ভট, কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন এবং কারা যে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকারকে ক্ষমতাশূন্য করে দিয়েছেন বাস্তবে– এটি বুঝা ও বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দেওয়া যাক। পাঠক আপনি পরিষ্কার দেখেছেন, ১৯৮৯ সালের আইনের ৭০ ধারায় কি আছে এবং এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩১ ধারায় ৭০ ধারাকে কিভাবে অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। পররাষ্ট্রের স্বার্থে তথায় আশ্রিত-লালিত-পৃষ্ঠপোষিত ক্ষুদে সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীকে চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্বেচ্ছায় ধ্বংস করে দেবার এমন ভয়াবহ ও ঘৃণ্য উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি দেখানো যাবে না।

www.pathagar.com

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — আটাশ

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৭৯ ধারায় বলা হয়েছে ঃ "কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি।– পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে, পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিকারমূলক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে"।

এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩২ ধারায় ১৯৮৯ সালের আইনের ৭৯ নাম্বার ধারা পরিবর্তন করা হয়েছে খুবই কৌশলের সঙ্গে এবং সরকারের কর্তৃত্বও ক্ষুণ্ন করা হয়েছে এবং সুযোগ বেড়েছে পার্বত্য তিন পরিষদের। বলা হয়েছে ঃ "৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে"।

এক্ষেত্রে ১৯৮৯ সালের আইনের সঙ্গে পার্বত্য চুক্তির সংশ্লিষ্ট অংশের পাঠে পার্থক্য কোথায় হলো, সংশোধন বা বদল কিভাবে হলো, তা দেখা দরকার। ১৯৮৯ সালের আইনে জাতীয় সংসদের গৃহীত আইনের কষ্টকর বা আপত্তিকর দিক থাকলে তা সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্যে পরিষদ লিখিতভাবে আবেদন করতে পারতো সরকারের নিকট। সরকার ঐ আবেদন বিবেচনা করে 'যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ' করার অধিকারী ছিল। অর্থাৎ জাতীয় সংসদ প্রণীত ঐ আইনের ব্যাপারে পরিষদের আপত্তি বা কষ্টকর বিবেচনায় এর সংশোধন বা শিথিল প্রয়োগের দাবী 'যুক্তিসঙ্গত' কিনা, সেটি বিচারের মালিক ছিল সরকার। অর্থাৎ বিষয়টি শেষাবধি সরকারের ইচ্ছা, বিবেচনা, ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল ছিল।

কিন্তু এখন 'যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে' কথাটি বাতিল করে পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩২ ধারায় লিপিবদ্ধ ১৯৮৯ সালের আইনের ৭৯ নাম্বার ধারায় সংশোধনী সাধনের ফলে সরকারের আর কোনো নিজস্ব এখতিয়ার, ভাবনা, কর্তৃত্বের, নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার নেই। এখন যা হলো তা হচ্ছে, পার্বত্য পরিষদের যে কোনোটি কেবল আপত্তি বা কষ্টকর বলে আবেদন জানালেই জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য আইনের ব্যাপারে সরকার পরিষদের 'আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ'-এ তৎপর হবে। অর্থাৎ এখন আর সরকারের স্বাধীন বিবেচনার সুযোগ নেই। পার্বত্য

www.pathagar.com

তিন পরিষদের যে-কোনোটির কাছ থেকে দাবী উঠলেই সরকারকে পার্বত্য তিন জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ প্রণীত আইনকে সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করবার দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হতে হবে। এখানে জাতীয় সংসদের লেজিসলেটিভ সুপ্রীমেসি এবং সরকার ও নির্বাহী বিভাগের এক্সিকিউটিভ সুপ্রীমেসি — উভয়ই বিনষ্ট হলো।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — ঊনত্রিশ

০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭-এ সম্পাদিত এবং স্বাক্ষরের সাথে সাথে বলবৎকৃত বলে ঘোষিত পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৩, ৩৪, ৩৫ ধারা এবং এবং এগুলির উপধারা ও অন্তর্ভুক্ত অংশের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা পরিষদের এখতিয়ার, কাজ ও দায়িত্বের পরিধি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ২২ ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একই আইনের প্রথম তফসিল (পরিষদের কার্যাবলী) এবং ৪৪ ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় তফসিল (পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর রেইট, টোল এবং ফিস) – এ দু'টিতে বর্তমান পার্বত্য চুক্তির ৩৩, ৩৪, ৩৫ ধারাত্রয় দ্বারা অনেক পরিবর্তন ও তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন করা হয়েছে।

১৯৮৯ সালের আইনের প্রথম তফসিলে পার্বত্য তিনটি জেলা পরিষদের কার্যাবলীর ১ নাম্বার অংশে আছেঃ "জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি বিধান"। এবার পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৩ ধারার 'ক' অংশে বলা হচ্ছে ঃ "প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে"। অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও এর উন্নতি ছাড়াও সমগ্র বিষয়াদির তত্ত্বাবধান (supervision)-ও পরিষদের এখতিয়ারের মধ্যে আনা হলো। এই সুপারিভশন বা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এ যাবৎ ছিল জেলার সাধারণ প্রশাসন এবং এর আওতাধীন ও এর দ্বারা পরিচালিত পুলিশ প্রশাসনের। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার ও ক্ষমতা এতে করে লোপ পেলো জেলার পরিস্থিতি তত্ত্বধানে। এছাড়া বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং উপজাতীয় তথা চাকমা-শান্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় শতকরা ৫০ ভাগ বাঙালীর জন্যে অত্যন্ত বেশি করে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার পুলিশের উপর শান্তিবাহিনীর ও উপজাতীয়দের বিশেষ নিয়ন্ত্রণের ফলে আইনের ব্যাপারে নির্বিশেষ সমতা, নিরপেক্ষতা, আইনের শাসন– সবকিছু মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে।

১৯৮৯ সালের আইন পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নাম্বার অংশে শিক্ষা বিষয়ক কার্যাবলীর বর্ণনায় ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ অংশে প্রাথমিক ও শিশু শিক্ষা, পাঠাগার, ছাত্রবৃত্তি, ছাত্রাবাস, বয়স্ক শিক্ষা, গরীব ও দুঃস্থ ছাত্রদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এর সঙ্গে তিনটি পূর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যবহ বিষয় তিন পার্বত্য পরিষদের আওতায় চলে গেল এবারকার পার্বত্য চুক্তি

www.pathagar.com

অনুযায়ী। এই চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৩ ধারার খ উপধারায় ঘোষণা দেওয়া হলো যে, "পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

আবার ১৯৮৯ সালের আইনের প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীতে ৬ নাম্বারে (কৃষি ও বন) 'খ' অংশে 'সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বা রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ'– এভাবে বিষয়টি রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বনের ব্যাপারে পরিষদের কোনো এখতিয়ার নেই বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু এবারকার পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৩ ধারার গ-উপধারায় "সংরক্ষিত বা" কথাটির বিলুপ্তি ঘটিয়ে পার্বত্য তিন জেলার বনাঞ্চলের উপর পরিষদের এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হলো।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — ত্রিশ

১৯৮৯ সালের আইন অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, এর দ্বিতীয় তফসিলে পার্বত্য তিনটি পরিষদের ২১ দফা কার্যাবলীর মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা, জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও বন, পশু পালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, হাট-বাজার, সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতিসহ নানাবিধ বিষয় রয়েছে।

কিন্তু এখন পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৪ ধারা অনুযায়ী পার্বত্য তিনটি জেলা পরিষদ জেলার যাবতীয় দিকের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। চুক্তি 'খ' খণ্ডের ৩৪ ধারা মোতাবেক জেলা পরিষদের কাজের আওতায় আরো যেসব অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;
(খ) পুলিশ (স্থানীয়);
(গ) উপজাতীয় আইনে সামাজিক বিচার;
(ঘ) যুব কল্যাণ;
(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
(চ) স্থানীয় পর্যটন;
(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;
(জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
(ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জল সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;
(ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
(ট) মহাজনী কারবার;
(ঠ) জুম চাষ।

www.pathagar.com

লক্ষণীয় যে, এত কিছু পার্বত্য জেলা পরিষদত্রয় নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়ার পর সরকারের হাতে আর কিছুই নেই। সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষও একেবারে অস্তিত্বশূন্য অবস্থায়। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় একেবারেই অবাঞ্ছিত প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি কাজে প্রতিটি দিকে – কি এখতিয়ারের প্রশ্নে, কি ক্ষমতা-কর্তৃত্বের প্রশ্নে। এরপরও সরকার সেখানে স্বীয় এখতিয়ার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বিসর্জন দেননি; সবঠিক আছে; চুক্তির বিরোধীরা মিথ্যাচার করছে– এসব কথা এক বিন্দুও গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া সরকার এত বিষয়ে, এত এখতিয়ার ক্ষমতা নিজে ছেড়ে পার্বত্য পরিষদত্রয়কে যে পরিমাণ শক্তিধর করেছে, তা কি সে বাংলাদেশের অন্য ৬১টি জেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করতে প্রস্তুত আছে? যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে কেবল পার্বত্য তিন জেলার জন্য এই ব্যবস্থা কেন? এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ১১ কোটি ৯৭$\frac{১}{২}$ লক্ষ মানুষকে বাদ দিয়ে, তাদেরকে অসম অবস্থানে এনে একটি অঞ্চল ও ক্ষুদে জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে, পুরো দেশকে সম সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এসব তো স্পষ্টতঃই সংবিধান বিরোধী। এর ১ নাম্বার ধারার ইউনিটধারী বা একক চরিত্র বিরোধী। কোর্টে এনফোর্সেবল ৫৯, ৬০ অনুচ্ছেদের স্থানীয় শাসন সূত্র বিরোধী। এটি সংবিধানের তৃতীয় ভাগের কোর্টে এনফোর্সেবল মৌলিক অধিকার বিষয়ক ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৬, ৪২ অনুচ্ছেদের বিরোধী।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — একত্রিশ

১৯৮৯ সালের আইনে এর ৪৪ ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে তফসিলে পার্বত্য তিনটি পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল, ফিস ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) স্থবির সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ।

(২) বিজ্ঞাপনের উপর কর।

(৩) পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরীর উপর টোল।

(৪) পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেইট।

(৫) পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস।

(৬) পরিষদ কর্তৃকত কৃত জনকল্যাণমূলক কাজ হতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস।

(৭) পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস।

(৮) সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।

এবার পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৫ ধারায় পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল, ফিস-এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ

www.pathagar.com

(ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি;

(খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

(গ) ভূমি ও দালান-কোঠার হোল্ডিং কর;

(ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

(ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

(চ) সরকারী ও বেসরকারী শিশু প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

(ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশবিশেষ;

(জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

(ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্রবা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ;

(ঞ) ব্যবসার উপর কর;

(ট) লটারীর উপর কর;

(ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

এখন আগের আটটি রেইট, টোল, কর খাতের সঙ্গে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলিসহ আরও বারোটি খাতে রেইট, টোল, কর পার্বত্য তিন পরিষদ কর্তৃক আদায়ের ক্ষমতা লাভের পর এই তিন জেলায় সরকারের হাতে কর-বিষয়ক আর তেমন কোনো ক্ষমতাই নেই। অথচ সরকার দাবী করছেন, তারা চুক্তিতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়েও কোনো এখতিয়ার ছাড়েননি। বস্তুত বাংলাদেশ সরকারের জাতীয়, কেন্দ্রীয়, একক প্রাধান্যশীল সর্বোচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে এই পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে। আবার এক্ষেত্রে দেশের অপর একটি জেলাকেও এ অধিকার, মর্যাদা, সুযোগ দেওয়া হয়নি। দুই বিধান ও অসমতা করা হয়েছে এভাবে। তাছাড়া ১৯৮৯ সালের সংসদের তিনটি সংশ্লিষ্ট আইন না পাল্টে কীভাবে সরকার চুক্তির মাধ্যমে সবকিছু ইচ্ছেমতো বদলে দিয়ে ঘোষণা দিলেন চুক্তিতেই যে, চুক্তিটি স্বাক্ষরের মুহূর্ত থেকেই বলবৎ হয়ে গেছে? এমন অধিকার কি সরকারের আছে?

এ প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে যে, উপরোক্ত ছ এবং ঝ দফায় যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় বনজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদের উপর সরকার লভ্য রয়ালটির অংশবিশেষ যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলাকে প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তেমনভাবে যদি সিলেট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া তাদের গ্যাসের জন্য, দিনাজপুর তার কয়লার জন্য, কিংবা দেশের অন্যান্য জেলা তাদের সীমানায় লব্ধ সম্পদের জন্যে রয়ালটি দাবি করে, তাহলে সরকার তাদেরকে কি সে অধিকার দেবে? যদি না দেয়, তাহলে সরকার কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন দিচ্ছে? এহেন দ্বিমুখী নীতি, দুই বিধান কেন করা হচ্ছে? এগুলি কীভাবে সংবিধান সম্মত?

www.pathagar.com

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — বত্রিশ

০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার যে পার্বত্য চুক্তি করেছে, তার 'গ' খণ্ডের দ্বারা গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হচ্ছে পুরোপুরি নতুন প্রপঞ্চ (new phenomena) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয়। মোট ১৪টি ধারা এবং বেশ কিছু উপধারা সম্বলিত এই খণ্ডের বিষয়াদি বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না রেখেই তৈরি হয়েছে ও গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের সামান্যম সুযোগ নেই। দেশের ৬১টি জেলা ও অন্য সকল অঞ্চল বাদ দিয়ে কেবল তিন পার্বত্য জেলা (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি বান্দরবান)-কে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তাদের সমবায়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন সম্পূর্ণ নতুন এক বিশেষ ব্যবস্থা।

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১ নাম্বার ধারানুযায়ী "পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে" "তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে"। র্অাৎ পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৫টি ধারা ও বহুসংখ্যক উপধারার মাধ্যমে সংবিধানকে পদদলিত করে; মৌলিক অধিকার, সমতা, সম সুযোগ, আইনের চোখে সমতা ও সমানাধিকার, নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের সম দৃষ্টি ইত্যাদিকে ধ্বংস করে; সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের ১ উপ-অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যানুযায়ী রাষ্ট্রের সংজ্ঞাস্বরূপ প্রদত্ত সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, এদেরকে পার্বত্য তিন জেলা ও পরিষদত্রয়ের ব্যাপারে এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বশূন্য করে রাঙামাটি খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান– এই তিন জেলাকে ও তাদের পরিষদত্রয়কে প্রায় Loose Confederal Structure এর অঙ্গরাষ্ট্রের অবস্থান প্রদান করার পর সেগুলির মধ্যে সংযোগসূত্র ও সমন্বয়কারী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (Hill Tracts Regional Council) গঠন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ-ও বলে দেওয়া হলো, পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের মাধ্যমে যে অস্বাভাবিক এবং দেশের ৬১ জেলার তুলনায় চূড়ান্ত অসম এখতিয়ার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, মর্যাদা পেয়েছে, এরপরও এগুলিকে "অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে" এই পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হচ্ছে। অর্থাৎ, পার্বত্য তিন জেলা ক্রমে ক্রমে আরো ক্ষমতাধর হয়ে আসলেই বিশেষ, স্বতন্ত্র অবস্থানে যাচ্ছে। যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতার দিকে। আর বিচ্ছিন্ন ঐ তিন জেলার স্বাধীন কেন্দ্রীয় কাঠামো হতে যাচ্ছে। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ। শান্তিবাহিনী যা চেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে। পেয়েছে তারা কল্পনাতীত। (দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক সংগ্রাম-এ ব্যক্ত বর্তমান লেখকের প্রতিক্রিয়া ০৪/১২/৯৭ এবং ০৫/১২/৯৭। চুক্তি সম্পাদনের পরের দিন জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে বর্তমান লেখকের বক্তব্য। দ্রষ্টব্যঃ সাপ্তাহিক বিক্রম ৯-১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭। বর্তমান লেখক ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে বহু সংখ্যক সেমিনারে এবং তার লিখিত ও

www.pathagar.com

প্রকাশিত বহুসংখ্যক গবেষণা প্রবন্ধে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই গত কয়েক মাস ধরে এমন আশঙ্কা করেছিলেন। দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক সংগ্রাম, New Nation, দৈনিক মিল্লাত, সাপ্তাহিক বিক্রম, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা। সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৯৯৭ এ প্রকাশিত সংখ্যাসমূহ। এছাড়া দেশের অন্যান্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় লেখকের উপরোক্ত আশঙ্কা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক সেপ্টেম্বর-নভেম্বর পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও মত বিনিময়কালে তার বিশ্লেষণ, আশঙ্কা ও সুপারিশ ব্যক্ত করেছেন)।

যাহোক, বাংলাদেশের সংবিধানে এমন স্পেশাল স্টেটাস বিশেষ তিন জেলাকে ও কোনো অঞ্চলকে প্রদানের সুযোগ আদৌ নেই। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী "আমরা, বাংলাদেশের জনগণ" একক সত্তা এবং এর কোনো বিভক্তি-বিভাজনের অবকাশ নেই। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং বিশেষত কোর্টে এনফোর্সেবল তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকার (২৬ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদ) অনুযায়ী কোনো সুযোগ নেই আইনের চোখে, রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড ও আচরণে, অঞ্চলের অবস্থানে ও মর্যাদায়, নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানাদির সাথে সংযোগ প্রশ্নে মূলনীতি অস্বীকার করার এবং মৌলিক অধিকারের ব্যত্যয় ঘটানোর। কোনোরকম অসমতা, বৈষম্য, আচরণে পার্থক্য, সুযোগের হের-ফের, অধিকার ও পাওনা থেকে বঞ্চনা ইত্যাদি মেনে নেওয়ার অবকাশ নেই। অনগ্রসরদের জন্যে করণীয় বা তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার যথার্থ ও বাস্তব পরিস্থিতিভিত্তিক ব্যাখ্যা দিতে হবে; বিকৃত, অসৎ উদ্দেশপ্রণোদিত প্রকৃত দাবী উল্টে-ধরা মনগড়া ব্যাখ্যা নয়। সংবিধানের ২৮(৪) এবং ২৯(৩) উপ-অনুচ্ছেদদ্বয়ের ব্যাখ্যাও তাহলে সঠিকভাবে বেরিয়ে আসবে। সরকার এই দু'টির নিতান্তই বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন চুক্তি পরবর্তী তাদের অফিশিয়াল ব্যাখ্যা দ্বারা (দ্রষ্টব্যঃ সংবাদ, ভোরের কাগজ, বাংলাবাজার, আজকের কাগজ, ০৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭)। কোনো অবস্থাতেই কারো সুযোগ নেই মৌলিক অধিকার খর্ব করার। এখানে উল্লেখ্য যে, Interpretation বা ব্যাখ্যা দিয়ে অধিকারকে বানচাল বা ধ্বংস করা যায় না। ১৯৭৭ সালের ১ সেপ্টেম্বরে 'আবদুল লতিফ মীর্জা বনাম বাংলাদেশ সরকার' মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এ্যাপিলেট ডিভিশনস এহেন ঘোষণা ও সে মোতাবেক রায় দেন। কোর্ট বলেন, The interpretation of the statute or law which preserves a fundamental human right is to be given rather than one which destroys it" (Ref. 31 DLR. AD. 1 decided on 1.9.1977. per K. Hossain J)"।

অন্য দিকে দিয়েও পূর্বোক্ত বিষয়টিকে দেখা যায়। সংবিধানের ৬(১) অনুচ্ছেদের "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব" এবং ৬(২) অনুচ্ছেদের "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী" এবং ৭(১) ও ৭(২) এর "জনগণ'– এসব কিছুও বিশেষ বিভাজনের অবকাশ দেয় না মোটেও। বাংলাদেশের সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে "স্থানীয় শাসন

www.pathagar.com

সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ"–এর কথা বলা হয়েছে "সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে"। বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ (শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ) বাঙালীকে বঞ্চিত করে, চিরস্থায়ীভাবে অধিকারহারা করে; ১২টির মধ্যে অন্তত ৭টি উপজাতিকে প্রতিনিধিত্বহীন করে কেবল চাকমাদের চিরস্থায়ী একচ্ছত্র স্বেচ্ছাচার কায়েমের সুযোগ করে দিতে, বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট জনসংহতি ও শান্তিবাহিনীর মনঃতুষ্টির জন্যে এহেন কাজ করা হয়েছে।

সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত" করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়নি এক দলকে সুযোগ দিয়ে, অন্য দলকে বঞ্চিত করার কথা। বলা হয়নি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বা ক্ষুদে জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করার কথা। বলা হয়েছে গণতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করার কথা।

সংবিধানের ১ এবং ২ অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্র"; ২(ক) অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম"; ৩ অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা"; ৪(১) অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের "জাতীয় সঙ্গীত"; ৪(২) অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা"; ৪(৩) অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক"; ৫(১) অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্রের রাজধানী"; ১০ অনুচ্ছেদে "জাতীয় জীবন"; ২১(১) অনুচ্ছেদে "জাতীয় সম্পত্তি"; ২৩ অনুচ্ছেদে "জাতীয় ভাষা" ও "জাতীয় সংস্কৃতি"; ২৫(১) অনুএেদ "জাতীয় সার্বভৌমত্ব"-এর কথা তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে বাংলাদেশ সংবিধান প্রজাতন্ত্র; একক রাষ্ট্র; একক জাতীয় অস্তিত্ব, পরিমণ্ডল ও ভাবনা; একক জাতীয় সার্বভৌমত্বের অবিভাজ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট, জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রের "oneness" এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটি করেই অস্তিত্বশীল। তাই "oneness"এর দ্বিখণ্ডায়ন করে বিশেষ অবস্থান, স্বতন্ত্র মর্যাদা, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত কর্তৃত্বের বিধান আমাদের সংবিধান দেয়নি। সংবিধানে 'স্থানীয় শাসন' প্রত্যয়টিই কেবল গ্রহণযোগ্য (দ্রষ্টব্যঃ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদ) ৫৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "প্রজাতন্ত্রের প্রত্যক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের" কথা স্বীকৃত। ৫৯(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "সংসদের আইনের দ্বারা" "প্রশাসনিক একাংশের" দায়িত্ব "নির্দিষ্ট" হবে, অন্য কোনো পন্থায় নয়। সংবিধানের ৬০ অনুচ্ছেদে "৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকরতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদের আইন দ্বারা" "স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে" কর আরোপের সুযোগ দেওয়া হবে, অন্য কোনো পন্থায় নয়। অথচ পার্বত্য চুক্তির 'খ' এবং 'গ' খণ্ডে উপরোক্ত সকল সাংবিধানিক সত্যকে একেবারেই অস্বীকার করা হয়েছে। একেবারে "স্থানীয় শাসন" প্রত্যয়টিই পরিষ্কার ঘোষণা দিয়ে পরিত্যাগ করা হয়েছে। পার্বত্য তিনটি পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং এদের সমন্বয়কারীই হচ্ছে "আঞ্চলিক পরিষদ"। পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ড মোতাবেক ভূমিকর সহ অন্যান্য আর্থিক আয় ও তহবিল প্রসঙ্গে সংবিধানের ৮৪(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত

www.pathagar.com

"সংযুক্ত তহবিল"; ৮৪(২) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত "প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব"; ৮৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত "সরকারী অর্থ"; "সংযুক্ত তহবিল" এবং "সংসদের আইন দ্বারা" আর "অনুরূপ আইনের বিধান না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত" হবার বিষয়সমূহ পার্বত্য চুক্তিতে অস্বীকৃত হয়েছে।

এভাবে পার্বত্য চুক্তি সংবিধানের শুধু চরমভাবে লংঘনই নয়, বরং এটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেই বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। এক দেশের মধ্যে দুই কর্তৃপক্ষের জন্ম দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ দিয়েছে। তথায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র, সংসদ, সরকার, সরকারী সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের অস্তিত্বকে বিনষ্ট করেছে। পার্বত্য অঞ্চলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটানোর সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে। এক দেশের মধ্য থেকে নতুন বিচ্ছিন্ন দেশের কার্যকর সূত্র তৈরি করেছে। কালে কালে স্পষ্ট হবে এসব সত্য।

বাংলাদেশ সংবিধানের কোর্টে এনফোর্সেবল প্রথম ভাগের (প্রজাতন্ত্র) ১ অনুচ্ছেদে ঘোষিত "বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে" — এই সর্বপ্রাধান্যশীল, একান্তই দেশের অস্তিত্ব-সংরক্ষণার্থে ভিত্তিমূলক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধানটিকে সরকার নস্যাৎ করেছে পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৫টি ধারা মারফৎ তিনটি পার্বত্য পরিষদকে স্বাধীন ও কার্যকর সকলক্ষমতার অধিকারী করে এবং 'গ' খণ্ডের ১৪টি ধারা মারফৎ এদের সমন্বয়কারী হিসেবে জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গড়ে তুলে।

এখানে উল্লেখ্য যে, জেনারেল এরশাদের শাসনামলে বাংলাদেশের সাতটি স্থানে হাইকোর্ট স্থাপন করে তদনুসারে দেশকে সাতটি অঞ্চলে ভাগ করে হাইকোর্টগুলির টেরিটোরিয়াল জুরিসডিকশন বা আঞ্চলিক এখতিয়ার নির্ধারণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের oneness of the state বিনষ্ট হয়েছে বলে একটি মামলা সুপ্রীমকোর্টে আসে। ঐ মামলায় অন্যতম আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। এখন তিনি পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে, এর 'খ' খণ্ডের 'স্থানীয় শাসন' বাতিলের দ্বারা সর্বক্ষমতাশীল, বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদাপ্রাপ্ত পরিষদত্রয়ের উদ্ভব এবং 'গ' খণ্ডের মাধ্যমে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের সৃষ্টি ও এর স্বতন্ত্র ও জাতীয় সরকারের কর্তৃত্বমুক্ত প্রায় স্বাধীন অবস্থান দেখেও প্রজাতন্ত্রের unitary চরিত্র এবং oneness of the state নষ্ট হচ্ছে না বলে ঘোষণা দেন পত্র-পত্রিকায় ও টিভি আলোচনায়। অথচ ১৯৮৯ সালে উপরোক্ত মামলায় কোর্টের কাছে তার সাবমিশন ছিল এরূপ ঃ "Fundamental norms of governance were reaffirmed and expounded in the preamble and Arts, 1 and 2 read with Art 143 of the constitution. For the realisation of these norms, a unitary sovereign Republic has been envisaged in the constitution.

www.pathagar.com

This unitary character is our 'birth jacket' which we inherit and is not a jacket given to us by anyone. The concept of unitary sovereign Republic is based on indivisible characteristics of sovereignty which cannot be territorially limited or divided."

অর্থাৎ, শাসনের মৌল রীতি পুনর্ব্যক্ত ও স্পষ্ট ব্যাখ্যাকৃত হয়েছে সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং অনুচ্ছেদে ১ ও ২ এর সঙ্গে অনুচ্ছেদ ১৪৩ একত্রে পাঠ করে। এই রীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে সংবিধানে একটি একক সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের বিধান করা হয়েছে। এই একক চরিত্র আমাদের 'জন্ম পরিচ্ছদ' যেটি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি এবং এমন পরিচ্ছদ নয় যা কেউ আমাদের দিয়েছে। একক সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের ধারণাটি সার্বভৌমত্বের অবিভাজ্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তিশীল যেটি আঞ্চলিকভাবে সীমিত বা বিভাজ্য হতে পারে না।

এর মানে হচ্ছে, এককেন্দ্রিক একক বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের এককত্ব পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন জেলা পরিষদের বিশেষ অবস্থান-এখতিয়ার-ক্ষমতা -কর্তৃত্ব দিয়ে, কিংবা পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের বিশেষ মর্যাদা (special status) দিয়ে বিভাজিত হতে পারে না কোনোমতেই।

উল্লিখিত মামলায় জাস্টিস বদরুল হায়দার চৌধুরীর মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

"The amendment purports to create territorial units which eventually may claim the status of federating units thereby destroying the very fabric of the unitary Republic. In other words by sowing the seeds of regionalism the next step can be dismantling the fabric of the Republic"

অর্থাৎ, এই সংশোধনী আঞ্চলিক এককসমূহ সৃষ্টির ঘোষণা দেয়, যা কালক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় এককসমূহের মর্যাদা দাবি করতে পারে। এর মাধ্যমে একক প্রজাতন্ত্রের একেবারে গঠন সৌধটিই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অন্যকথায়, আঞ্চলিকতার বীজ বপনের পর পরবর্তী পদক্ষেপ হবে প্রজাতন্ত্রের গঠনসৌধটিই ধ্বংস করা।

দেখা যাচ্ছে, ১৯৮৯ সালের Constitution 8th Amendment case-এ সংবিধানের preamble এবং অনুচ্ছেদ ১, ২ ও ১৪৩-এর একত্রিত পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের এককত্ব বিনষ্ট করার কোনো সুযোগ নেই বলে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, এটি নাকি যুক্তরাষ্ট্রীয় এককের মর্যাদা দাবী করে প্রজাতন্ত্রের গঠনসৌধ ধ্বংস করে আঞ্চলিকতার পথে পরের পদক্ষেপে খোদ রাষ্ট্রটিকেই ধ্বংস করে দিতে পারে। কাজেই সুপ্রীম কোর্ট ঐ মামলায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ও প্রজাতন্ত্রের এককত্বের যুক্তি দেখিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের oneness এবং unitary চরিত্র সংরক্ষণের জন্যে এরশাদ সরকার কর্তৃক গৃহীত আঞ্চলিক বিভাজনকে 'ultravires' ও 'invalid' ঘোষণা দিয়ে বাতিল করে।

www.pathagar.com

এক্ষণে একইভাবে পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের মাধ্যমে 'স্থানীয় শাসন' তুলে দিয়ে পার্বত্য তিন জেলার বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতা এবং 'গ' খণ্ড অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন অবশ্যই সংবিধান বিরোধী। এটিও উপরোক্ত মামলার সংশ্লিষ্ট বিষয়টির তুলনায় বহুগুণ মারাত্মকভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রের oneness এবং unitary sovereign (একক সার্বভৌম) চরিত্র ধ্বংস করছে। তাই এ বিষয়টিও সর্বোচ্চ আদালতে মামলাযোগ্য। সংবিধান, আইন, ন্যায়, যুক্তির বিচারে এটি বাতিলযোগ্য।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — তেত্রিশ

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১ ধারায় বলা হয়েছে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। এখন তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কিভাবে গঠিত হবে? এক্ষেত্রে তৈরী করা হয়েছে মারাত্মক সমস্যা। পার্বত্য চুক্তির 'ক' খণ্ডের ১ ধারানুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে "উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে মেনে নিতে হবে, যদিও এখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী এবং তাদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ১ নাম্বার ধারা মোতাবেক "উপজাতি" সত্তা স্বীকার করে নিতেহবে। 'খ' খণ্ডের ২ ধারানুযায়ী 'স্থানীয় সরকার পরিষদ' থাকবে না, সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'স্থানীয় শাসন' থাকবে না, 'প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশ' থাকবে না; হবে কেবল পার্বত্য জেলা পরিষদ। যদিও ১ নাম্বার ধারানুয়ায়ী "উপজাতি" সত্তা স্বীকৃতি পাবে, কিন্তু শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এবং একক সংখ্যাগিরষ্ট হয়েও "বাঙালী" সত্তা থাকবে না। আওয়ামী লীগ সরকার তাদের প্রয়াত নেতা শেখ মুজিবের আদর্শ এক্ষেত্রে পরিত্যাগ করেছেন, নিজেদের দলীয় আদর্শ এবং তাদের বাঙালীত্বের সর্বোচ্চ আবেগকে বিসর্জন দিয়েছেন। কেননা, সরাসরি "বাঙালী" শব্দ এলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিভাবে বহিরাগত উপজাতিরা সব পাচ্ছে এবং আরো স্পষ্ট করে বললে জনসংহতি-শান্তিবাহিনীর ইচ্ছানুযায়ী মূলতঃ চাকমারা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং এদেশের মূল অধিবাসী বাঙালীরা (মুসলমানরা) বিসর্জিত হচ্ছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব পার্বত্য চুক্তির 'ক' খণ্ডের ১ ধারায় "উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল" প্রত্যয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। কেন এটি উপজাতি-বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চল নয়? কেন এটি বাংলাদেশী পরিচয়ে আসছে না? 'খ' খণ্ডের ১ ধারায় "উপজাতি" প্রত্যয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। সারা চুক্তিতে এই প্রত্যয়টির স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু কোথাও একবারও 'বাঙালী' শব্দটি নেই। যদিও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তার প্রশ্নে আমরা সাংবিধানিকভাবে সবাই বাংলাদেশী। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে "উপজাতীয়", তারা তাদের স্বীকৃতি আদায় করলো; কিন্তু বাঙালীত্বের দাবীদার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় জাতীয়তায় বাংলাদেশী কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় বাঙালীকে, তথাকার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ শতকরা ৫০ ভাগ মানুষকে তাদের 'বাঙালী' অভিধা স্বীয় দলীয় নীতি-বিশ্বাসকে ছুঁড়ে ফেলে মুছে দিল কেবলই সংকীর্ণ স্বার্থে, গূঢ় উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩ ধারায় "অ-উপজাতীয়" প্রত্যয়টি বাঙালীদের জন্যে বরাদ্দ হলো। অর্থাৎ বাংলাদেশে ১২ কোটি "অ উপজাতি" এবং ০.২২% কিংবা সব উপজাতি ধরলে তার চেয়ে কিছু বেশি অবস্থান গ্রহণকারীরা "উপজাতি"। এবার ১২ কোটি বাংলাদেশীও নয়, বাঙালীও নয়, তারা "অ-উপজাতি"। বৈষয়িক বিবেচনা মানুষকে যে কি পরিমাণ কাণ্ডজ্ঞান ও যুক্তিরহিত করে দিতে পারে, তার প্রমাণ এ থেকে পাওয়া যায়।

আবার পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাভাষী বাঙলাদেশীরা শতকরা ৫০ ভাগ হয়েও বাঙালীতো নয়ই, তারা এমনকি "অ-উপজাতীয়" কি-না, সেটির বিচারকর্তা পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৪ ধারার 'গ' ও 'ঘ' উপধারা মোতাবেক উপজাতীয় সার্কেল চীফ এবং উপজাতীয় হেডম্যান। বহিরাগত গোষ্ঠীর হেডম্যানের সার্টিফিকেট পেলে তবে একই গোষ্ঠীর সার্কের চীফ সিদ্ধান্ত দেবেন কোনো বাংলাভাষী বাংলাদেশী বাঙালী বনী আদম নিজ দেশের এক-দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন কি বাঙালীও নয়, শুধুই "অ-উপজাতীয়" কি-না।

সমগ্র পার্বত্য চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে "উপজাতীয়"দের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে নিষ্ঠুরতম পরিস্থিতিতে ফেলা হয়েছে নিজ দেশে বাংলাদেশী মুসলমানদের, আওয়ামী লীগ সরকারের শ্লোগান-সর্বস্ব বিবেচনায় আসা বাঙালীদের এবং আওয়ামী লীগ সরকারকৃত পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক "অ-উপজাতীয়"দের। পার্বত্য চট্টগ্রামে এদেশবাসী সবাই শান্তি চায়, রক্তঝরা আর দেখতে চায় না। আমরা সবাই শান্তি প্রত্যাশী। কোনো ন্যায়নিষ্ঠ, যুক্তিশীল মানুষ হানাহানি পছন্দ করে না। কিন্তু শান্তির সোল এজেন্সী যে সরকার নিয়েছে, তারা কীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চুক্তি করে "উপজাতি" এবং "অ-উপজাতি"তে চিরস্থায়ীভাবে বিভক্ত করে চিরস্থায়ী অশান্তির বিষ বৃক্ষের বীজ রোপণ করলো। ১৯৭২-৭৫ এ এই আওয়ামী লীগ সরকার উপজাতীয়দের কোনো দাবী না শুনে, এতটুকু সৎ বিবেচনা না দিয়ে জোর করে তাদেরকে বাঙালী বানানোর চেষ্টায় ফলেই তো বিচ্ছিন্নতাবাদী জনসংহতি ও সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর জন্ম হলো। এরা তখন বাংলাদেশী সত্তা তুলে ধরে এর আওতায় বাঙালী-উপজাতি সবাইকে এ্যাকোমোডেট করতে পারতেন। তারা তখন যেমন জিদ করে, ভ্রান্ত পথে গিয়ে সমস্যা তৈরি করেছেন, আজও তেমনি তাদের দলেরই সরকারের উদ্যোগে স্থায়ী অশান্তির আয়োজন করছেন। চাটুকাররা, দলীয় ধামাধরারা যা-ই বলুক না কেন, সত্য তো এটিই। হালুয়া-রুটি দিয়ে, আখের গোছানোর সুযোগ করে দিয়ে গণ মাধ্যম, রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে গায়ের জোরে যা-ই বুঝানো হোক না কেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাতে করে শান্তি আসবে না। বাস্তবতাবোধ, সততা, যুক্তিনিষ্ঠা প্রয়োজন। নচেৎ নিজেরা আজ সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধার করলেও পরিণামে দেশ ডুবে যাবে এবং সেই সঙ্গে নিজেরাও বাঁচবেন না, দু'চারজন ব্যক্তিগতভাবে দূর দেশে পগাড়পার হলেও।

www.pathagar.com

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — চৌত্রিশ

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৪ ধারার 'ক' উপধারায় বলা হয়েছে ঃ "প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩(তিন)টি আসন থাকিবে। এসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে"।

এখানে যা বুঝা দরকার তা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ হয়েও এক তৃতীয়াংশ পাবে। কিন্তু কেন? উপজাতীয়রা যদি দু'জন মহিলা সদস্য পায় সবাই মিলে তথাকার জনসংখ্যার অর্ধেক হবার পর, তাহলে বাঙালীরাও তো ন্যায়ত অর্ধেক পাবার কথা। সেক্ষেত্রে ২ জন বাঙালী এবং ২ জন উপজাতীয় হলে তো ন্যায় বিচার হতো। আবার 'উপজাতীয়' হেডম্যান ও সার্কেল চীফ ঠিক করবে কে 'অ-উপজাতীয়'। অর্থাৎ অ-উপজাতীয় মহিলা আসনে প্রার্থীদের মধ্যে তারই কেবল অ-উপজাতীয় সংজ্ঞায় পড়ার সম্ভাবনা থাকবে– (১) যার যথেষ্ট মেধা ও যোগ্যতা নেই, যার কোনো উদ্যোগ থাকবে না বাঙালীদের ব্যাপারে; (২) যিনি উপজাতীয়দের হাতের পুতুল হাতে রাযী হবেন; (৩) যিনি শাসকদল আওয়ামী লীগের সমর্থক হবেন। অর্থাৎ যোগ্য অ-উপজাতীয় বাদ দিয়ে চাটুকার অ-উপজাতীয় মহিলা প্রার্থীই সদস্যপদ লাভ করবেন। এছাড়া উপজাতীয়দের মধ্যে যে দু'জন হবে, তারা চাকমা বৈ অন্য কোনো ক্ষুদে উপজাতিদের ভিতর থেকে আসার সম্ভাবনা নেই। দেখা যাচ্ছে, সেখানে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের বাঙালীরা সংখ্যানুপাতে মহিলা আসন পাবে না, যথাযোগ্য মহিলা প্রার্থীকে সদস্য করতে পারবে না। ক্ষুদে উপজাতিগুলিও মহিলা প্রতিনিধি বানাতে পারবে না। বরাবরের মতো আসল মাখন খাবে শান্তিবাহিনীর নেতৃত্বে চাকমারা।

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৪ ধারার 'খ' উপধারা মোতাবেক ১৯৮৯ সালের মূল আইনের ৪ নাম্বার ধারার ১, ২, ৩, ৪ উপধারা বলবৎ থাকবে। মূল আইনের ৪ ধারার ঐ চারটি উপধারাতেই তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন প্রক্রিয়ার বিধান আছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ১৯৮৯ সালের মূল আইনের ৪ ধারার ১ (ক) এবং ৪ উপধারা মোতাবেক এবং পার্বত্য চুক্তির স্বীকৃতি অনুযায়ী পরিষদ গঠন করলে তিনটি পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যানই স্থায়ীভাবে 'উপজাতীয়' হবেন। কোনোদিন, কখনোই বাঙালীরা ঐ পদে যেতে পারবে না। এ কেমন গণতন্ত্র? পার্বত্য চট্টগ্রামের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমান শতকরা ৫০ ভাগের কোনো প্রতিনিধিত্ব আজীবন এক্ষেত্রে থাকবে না। থাকবে কেবল উপজাতীয়দের। আর বাস্তবে ছোট ছোট উপজাতি গোষ্ঠীও কোনোদিনই চেয়ারম্যান পদ পাবে না। মূলতঃ চাকমা এবং কখনো মারমাদের মধ্যেই এ পদ চিরস্থায়ীভাবে সীমিত থাকবে। গণতন্ত্রের এমন সার্কাস বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না। সত্যিই, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'। কিংবা 'সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ'!!! হায় গণতন্ত্র! হায় সংবিধান! হায় মৌলিক অধিকার! হায় সমতা, সম সুযোগ, সম অধিকার, বৈষম্যমুক্তি, আইনের চোখে সাম্য!

www.pathagar.com

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — পঁয়ত্রিশ

পার্বত্য চুক্তির 'খ" খণ্ডের ৪ (খ) ধারা দ্বারা পুনঃঘোষিত ১৯৮৯ সালের আইনের ৪ ধারার ১ উপধারা অনুযায়ী (ক) চেয়ারম্যান, (খ) বিশজন উপজাতীয় সদস্য এবং (গ) দশজন অ-উপজাতীয় সদস্য সমন্বয়ে প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হবে। এর সঙ্গে ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭-এর পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৪ (ক) ধারা মোতাবেক আরও তিনজন করে মহিলা সদস্য পার্বত্য তিনটি জেলা পরিষদে থাকবে। এর ভিতর দুইটি সদস্যপদ উপজাতীয়দের দখলে থাকবে। তাহলে ১৯৮৯ সালের আইন এবং ১৯৯৭ সালের চুক্তি ঘোষণা একত্রে করলে দেখা যায় পার্বত্য জেলা তিনটির তিন পরিষদের প্রত্যেকটিতে উপজাতীয় চেয়ারম্যান, বিশজন উপজাতীয় সদস্য এবং দুইজন উপজাতীয় মহিলা সদস্য মিলে একত্রে ২২জন উপজাতীয় সদস্য এবং একজন উপজাতীয় চেয়ারম্যান (১৯৮৯-এর আইনের ৪ ধারার ৪ উপধারা এবং পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৪ ধারার 'খ' উপধারা দ্বারা সমর্থিত)। অর্থাৎ উপজাতীয়রা ২৩ জন, আর বাঙালী তথা অ-উপজাতীয় ১০ জন এবং চেয়ারম্যানও তাদের। তথায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীকে কি নিষ্ঠুর পন্থায় চিরস্থায়ীভাবে গণতান্ত্রিক অধিকারহারা এবং উপজাতি একচ্ছত্র কর্তৃত্বের দ্বারা নিষ্পেষিত করার ব্যবস্থা করা হলো।

আবার পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৪ (খ) ধারা দ্বারা সমর্থিত ১৯৮৯ সালের আইনের ৪ ধারার ৩ উপধারা অনুযায়ী চাকমা, মারমা, তনচৈংগা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখো, খিয়াং–এই সাতটি উপজাতি কেবল পরিষদে সদস্য পাঠাতে পারবে। আর ক্ষুদে ছয়টি উপজাতির কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। যাদের প্রতিনিধিত্ব একেবারেই থাকবে না, তারা হচ্ছে মুরং, বোম, খুমি, রিয়াং, উসাই, চাক। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে– মুরং উপজাতির জনসংখ্যা তনচৈংগাদের চেয়ে অধিক হওয়া সত্ত্বেও তারা কেন প্রতিনিধিত্ব পেলো না। সেকি কেবল তারা তনচৈংগাদের ন্যায় বৌদ্ধ নয় বলে? তারা সর্বপ্রাণবাদী বলে? তনচৈংগাদের সঙ্গে চাকমা সন্তু লারমাদের ধর্মগত মিল (উভয় গোত্রই বৌদ্ধ) থাকার কারণেই সন্তু ও শান্তিবাহিনী তনচৈংগাদের প্রেফার করেছে কি? গণতন্ত্র, সম অধিকার, সম সুযোগ, পশ্চাদপদদের উন্নতি ইত্যাদির নামে এত কারচুপি, পক্ষপাত, অসততা ও কূটকৌশল কেন?

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — ছত্রিশ

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ২ ধারা মোতাবেক উপরোক্ত কায়দা-কৌশল ও চিরস্থায়ী অসমতা-অধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। এই চেয়ারম্যান অবশ্যই উপজাতীয় এবং একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ হবেন। এ উপজাতি চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবার কালেও জনসংখ্যায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও বাঙালীরা তিন জেলা পরিষদে নিষ্ঠুরতমভাবে প্রতিনিধিত্বলঘু হবার কারণে সামান্যতম ভূমিকাও রাখতে পারবে না। অথচ চেয়ারম্যান চেপে বসবে তাদের উপর।

www.pathagar.com

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৩ ধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যানসহ ২২ সদস্যের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। একই ধারার শর্ত মোতাবেক পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবে। পরিষদের গঠন হবে এরূপ ঃ চেয়ারম্যান — ১ জন। অবশ্যই এ পদে চাকমা ছাড়া আর কারো যাবার সুযোগ নেই। কেননা সর্বত্রই তাদের একক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং জনসংহতি ও শান্তিবাহিনীতে মূলতঃ তাদেরই নেতৃত্ব ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। পরিষদের সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ) ১২ জন এবং সদস্য উপজাতীয় (মহিলা) ২ জন। মোট ১৪ জন উপজাতীয়। আর সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ) ৩ জন এবং সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা) ১ জন। মোট ৭ জন। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ বাঙালী মুসলমান পাবে কেবল এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব তথা ৭ জন। ওদিকে চাকমারা ০.২২ ভাগ অর্থাৎ শতকরা ১ ভাগের অর্ধেকের অর্ধেকের কম হয়েও পাবে একাই ৫ জন প্রতিনিধি। মারামারা (মগ) পাবে ৩ জন, ত্রিপুরা ২ জন, মুরং ও তনচৈঙ্গা থেকে ১ জন। আর লুসাই, বোম পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং– এই সবাই মিলে ১ জন। বিশেষতঃ বাঙালীদের সাথে চাকমাদের তুলনায় এক্ষেত্রে স্পষ্ট যে, সন্তু বাবু এবং আবুল হাসনাতরা বানরের পিঠা ভাগই করেছেন বটে!

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৫ ধারা অনুযায়ী পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্য পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হবে।

এ থেকে পরিষ্কার যে, আওয়ামী লীগ সরকার এত বেশি গণতন্ত্রের, সাম্যের ও অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলেও বাস্তবে গণতন্ত্র হননের, সাম্য নিধনের ব্যবস্থা করেছে। তারা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা (Separate Electorate System) চালু করেছে বাস্তবে। এভাবে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃকই দেশে নতুন করে সরকারীভাবে, আনুষ্ঠানিক পন্থায়, লিখিত ঘোষণায় সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপিত হলো। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্যে এটি সবচেয়ে গভীর অশনি সঙ্কেত।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — সাঁইত্রিশ

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৬ ধারায় বলা হয়েছে ঃ "পরিষদের (অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের) মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে"।

www.pathagar.com

এক্ষণে পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৫টি ধারা এবং বহু সংখ্যক উপধারা মোতাবেক (যা উপরে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা হয়েছে) তিনটি পার্বত্য জেলার অনুরূপ যাবতীয় এখতিয়ার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুযোগ পেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদও বাজেট, বিধি প্রণয়ন থেকে শুরু করে, কর্মচারী নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত একচ্ছত্র অধিকার পাবে; চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা পাবে। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদাবিশিষ্ট ভূখণ্ড। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হবে কনফেডারেল কাঠামোর কেন্দ্র এবং এর অঙ্গ রাষ্ট্র তিনটি হবে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান। বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের একক, সার্বভৌম, স্বাধীন (unitary, sovereign, independent) চরিত্র এভাবে ধূলিস্মাৎ হয়েছে। এর এককত্ব (oneness) চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়েছে। দেশের মধ্যে আরেক দেশ গজিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হচ্ছে। যদি এখন পার্বত্য চুক্তির বিষয়াদি দেখে, এত যুক্তি-প্রমাণ দেখেও কারো বিশ্বাস না হয়, তাহলে তাকে অপেক্ষা করতে হবে সেদিনের জন্য, যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে দিনের আলোতে হাতছাড়া হয়ে গেছে এ সত্য তিনি দেশের সবচেয়ে সম্পদ-সমৃদ্ধ ও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এক-দশমাংশ আইনগত, রাজনৈতিক, ভৌগলিক ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মোতাবেক হারানোর পর বুঝতে পারবেন। কে, কারা, কোন্ পক্ষ দেশ, জাতি, জনগণকে ঠকিয়েছে, তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তাদের সঙ্গে মিথ্যাচার করেছে, তাদের সঙ্গে মুনাফিকী ও বেঈমানী করেছে, তা নিকট অথবা অনতিদূর ভবিষ্যতেই দেশবাসী বুঝতে পারবে। পার্বত্য চুক্তির মাজেজা এক সময় সর্বসাধারণের কাছে উন্মোচিত হবে। তখন অবশ্য আর কিছুই করার থাকবে না।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — আটত্রিশ

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ধারা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে বিশাল এখতিয়ার, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্বের মালিক করা হয়েছে।

৯ (ক) ধারায় বলা হয়েছে যে ঃ "পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে"।

দেখা যাচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার ডেপুটি কমিশনারের এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের আর কোনো দায়িত্ব নেই। তাদেরকে কার্যতঃ অস্তিত্বশূন্য করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডও কর্তৃত্বহীন হয়ে পড়ছে। সকল এখতিয়ার ও ক্ষমতা যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কাছে। বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্ব ও

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ মোটেও থাকছে না। এটি আরো উলঙ্গভাবে ধরা পড়ছে অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব বা অসঙ্গতির ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের কিছুই করার নেই। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদই সর্বেসর্বা। "আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে"। এরপরও পার্বত্য চুক্তির পক্ষে কোরাস ধরে মিথ্যাচার ও লোক ঠকানোর কোনো অবকাশ আছে? এতটুকু সততা যার আছে, সে যদি প্রকৃত অর্থে বুঝতে পারে, তাহলে এই চুক্তির সার্বিক ও ছত্রে ছত্রের ভয়াবহতা অনুধাবনপূর্বক এর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করবেই। এই চুক্তি আসলেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের হাতছাড়া করছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — উনচল্লিশ

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৯ (খ) ধারা অনুযায়ী পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহের কাজের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে।

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯ (গ) ধারা অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। তাহলে তিন জেলার ডিসি, এসপি, উন্নয়নের অন্যান্য বিভাগের আওতা, ক্ষমতা, কাজ কি হবে? আসলে সব ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদ। প্রশাসনের যে যেখানে আছে, সবাই হবে এর একান্ত অনুগত ভৃত্য।

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯ (ঘ) ধারা অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করবে। পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯ (ঙ) ধারা অনুযায়ী উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে।

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯ (চ) ধারা অনুযায়ী ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতাটি বাংলাদেশের জাতীয় সরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে দেওয়া হয়েছে। এর পরও কি কারো বুঝার বাকি আছে চুক্তির স্বরূপ? বাংলাদেশ সরকার কি দেশের অপর কোনো বিভাগ বা অঞ্চলকে এরূপ ক্ষমতা দিতে রাযী আছে? যদি না থাকে, তাহলে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠনই বা কেন এবং এর হাতে উপরোক্ত ক্ষমতা প্রদানই বা কেন, কার স্বার্থে?

পার্বত্য চট্টগ্রামে আরেকটি ইসরাইল তৈরি হবে শেষ পর্যন্ত? নাকি তা যাবে সিকিমের মতো ভারতের পেটে?

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — চল্লিশ

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১০ ধারায় বলা হচ্ছে ঃ "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন"।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের জন্য এবং এই বোর্ড দীর্ঘদিন ধরে খুব সাফল্যের সঙ্গে তা করে আসছে। এতে চট্টগ্রাম এরিয়ার জি. ও. সি. চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, পার্বত্য তিন জেলার ডেপুটি কমিশনারসহ বহু পদস্থ বেসামরিক-সামরিক কর্মকর্তা রয়েছেন। এখন থেকে এরা সবাই বোর্ডের সদস্য হিসেবে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করবেন। শুধু তা-ই নয়। জি. ও. সি. বা বিভাগীয় কমিশনার নয়, বরং উপজাতীয় ব্যক্তিকে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগে অগ্রাধিকার দেবার বিধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের বিভাগসমূহ ও কর্মকর্তারা ক্ষমতাশূন্য তো হলেনই, নতুন ব্যবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ শতকরা ৫০ ভাগ বাঙালীরও কোনো সুযোগ নেই। বোর্ডের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে প্রদত্ত যাবতীয় ক্ষমতা চলে যাবে উপজাতীয়দের হাতে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের জাতীয় সরকারের ও বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব কেন সব স্থান থেকে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে? পার্বত্য চট্টগ্রাম কি বিচ্ছিন্ন হয়ে "জুম্মল্যান্ড" বা "চাকমাল্যান্ড" হতে যাচ্ছে?

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — একচল্লিশ

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১১ ধারায় বলা হয়েছেঃ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসঙ্গতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে"।

এই ১১ ধারাটি দেখেই স্পষ্ট হয় যে, ভারত-ভূখণ্ডে আশ্রয়গ্রহণকারী ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট জনসংহতি ও শান্তিবাহিনীর একটি অংশের নেতা সন্তু লারমার সঙ্গে বৈঠক ও চুক্তি করার জন্যে আওয়ামী লীগ সরকার কেবল প্রধানমন্ত্রীর ফুফাতো ভাইকেই নিয়োগ করেনি বরং সেই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ডিমোগ্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিকস্ সম্পর্কে অজ্ঞ; পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ-সম্ভাবনা ও ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব সম্পর্কে অনবহিত; দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস ভূগোল-রাজনীতি ও সামরিক বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞ; রাষ্ট্রের সংবিধান, প্রজাতন্ত্র-রাষ্ট্র-সংসদ-সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ-প্রশাসন সম্পর্কে অজ্ঞ; গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, সাম্য, আইনের শাসন সম্পর্কে অজ্ঞ; সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, ১৯০০ সালের হীল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন, ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিষয়ক আইন তিনটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত এক ব্যক্তিকে সরকারের প্রতিনিধি বানিয়েছে। সঙ্গে ততোধিক অজ্ঞ; দলীয় ধামাধরা চট্টলার এক ব্যক্তিও থেকেছেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে যুক্ত না হয়েও পানি চুক্তি-নাট্যানুষ্ঠানের ন্যায় এবারও পার্বত্য চুক্তির ক্ষেত্রে চেপে বসেছেন মঞ্চবাহিনীর অতি ধূর্ত কুশীলব।

www.pathagar.com

সরকারী কমিটির নেতা জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ ও সরকার দলীয় চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ কি জানেন না যে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে মৌল আইন ধরে নিয়ে ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে পূর্বোক্তের সঙ্গে কোনো অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে তা আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে দূর করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900-এর তো কোনো অস্তিত্বই নেই এখন বাংলাদেশে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ১৯৮৯ সালের ১৬ নাম্বার আইন দ্বারা যে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি রহিত করা হয়েছে, তা সরকারী কমিটির নেতা জানেন না। তিনি বর্তমান জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ। তিনি সরকারী দলকে সংসদে চালাবেন আর তিনিই জানেন না, সংসদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কখন কোন্ আইনটি রহিত বা বাতিল হয়েছে! সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১৯০০ সালের বিধি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক রহিত হয়েছে, এটি না জেনেই এই আইনের reference দিয়ে বাতিলকৃত এবং বর্তমানে অস্তিত্বহীন আইনকে মূল আইন ধরে, ভিত্তি হিসেবে ধরে ১৯৮৯ সালে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে ঐ বাতিলকৃত আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার হুকুম জারি করছেন সরকারী কমিটির সকল নেতা। আর বর্তমানে অস্তিত্বহীন এ আইনের সঙ্গে সংসদ প্রণীত এবং বর্তমানে চালু থাকা আইন না মিললে চালু থাকা আইনেরই 'অসঙ্গতি' দূর করাবেন আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সন্তু লারমার 'আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রম'।

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধি যে আর নেই এবং এটি যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক জেনারেল এরশাদের শাসনামলে রহিত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে জাতীয় সংসদের কৃত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রাসঙ্গিক সূত্রাদি এখানে দেওয়া হলো।

দ্রষ্টব্যঃ রেজিস্টার্ড নং ডিএ-১। বাংলাদেশ গেজেট। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অতিরিক্ত সংখ্যা। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত। বৃহস্পতিবার, মার্চ ২, ১৯৮৯। ৫ম খণ্ড-বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন ১৩৯৫। ২ মার্চ ১৯৮৯। গেজেটের উদ্ধৃতি দেখুন-

"সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২রা মার্চ, ১৯৮৯ (১৮ই ফাল্গুন ১৩৯৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

১৯৮৯ সালের ১৬ নং আইন

Chittagong Hill Tracts Regulation, ১৯০০ রহিত এবং পার্বত্য জেলাসমূহে কতিপয় প্রচলিত আইনের প্রয়োগ ও উক্ত জেলাসমূহের জন্য কিছু বিশেষ বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন,

www.pathagar.com

যেহেতু Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Regulation 1 of 1900) রহিত করা এবং পার্বত্য জেলাসমূহে কতিপয় প্রচলিত আইন প্রয়োগ ও উক্ত জেলাসমূহের জন্য কিছু বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন পার্বত্য জেলাসমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে"।

"৩। Regulation 1 of 1900 রহিতকরণ।-এই আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Regulation 1 of 1900), অতঃপর উক্ত Regulation বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধি ১৯০০ রহিত করার সময় এর যেসব ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে তা ১৯৮৯ সালের আইনে রেফারেন্সসহ গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব ১৯০০ সালের বিধি বাতিলের পর ১৯৮৯ সালের আইনই কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামে চালু থাকা ইন্সট্রুমেন্ট।

উপরের প্রমাণ থেকে এটি পরিষ্কার যে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধি হিসেবে এখন আর কিছুই অস্তিত্বশীল নয়। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ আট বছর আগে তা বাতিল করেছে। ঐ বাতিলকৃত আইনকে ভিত্তি ধরে তার সঙ্গে একই সালে সংসদ প্রণীত এবং বর্তমানে কার্যকর ও পার্বত্য চুক্তি কর্তৃক স্বীকৃত আইনের অসঙ্গতি দেখা দিলে তা দূর করার কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা চরম মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ। অস্তিত্বহীন আইন রাখার জন্যে আবুল হাসনাত আবুদুল্লাহ পার্বত্য চুক্তি মারফৎ ব্যবস্থা নিয়েছেন। আর সঙ্গতি বিধান করতে চাচ্ছেন বায়বীয় আইনের সঙ্গের অস্তিত্বশীল আইনের! ধন্য, সরকারী নেতার বিদ্যার দৌড়!

এটি ভালভাবেই বুঝা গেছে অযোগ্য সরকারী নেতা কিছু না জেনেই, কিছু না বুঝেই, নিজের ও সহযোগীদের পর্বত প্রমাণ অজ্ঞতা নিয়েই জনসংহতি-শান্তিবাহিনীর সন্তু লারমা গং-এর সঙ্গে বসেছেন একের পর বৈঠকে। সন্তুরা তাই তাদেরকে লেজে-গোবরে করে ঘোল খাইয়েছে। আর এই চুক্তি নিয়ে ঢোল পিটাচ্ছেন সরকার প্রধান, মন্ত্রীবর্গ, সরকারী নেতারা ও সমর্থক চাটুকার দলীয় সুযোগসন্ধানী বিবৃতিজীবীরা।

অবশ্য সন্তুরা পার্বত্য চুক্তিতে সব পেয়ে গেলেও তাদের নিজেদের যোগ্যতায় যে এসব পায়নি, তাও পরিষ্কার। সন্তু বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (শান্তিবাহিনী)-র নামে প্রায় অর্ধশত উপধারাসহ যে পাঁচ দফা দাবীনামা বাংলাদেশ সরকারের নিকট পেশ করেছিলো, তাতেও পরস্পর বিরোধিতা ও অজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। কিন্তু এবার চুক্তিতে সন্তু গং বাংলাদেশ সংবিধান, প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্র, সরকার, জাতীয় সংসদ, সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় শাসন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও অখণ্ডতাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশ্নে যেভাবে পদাঘাত করে, ইচ্ছেমতো শর্ত দিয়ে, ব্ল্যাকমেইল করে ঝাটাপেটা করে দূর করেছে এবং যেভাবে পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রামকে বিশেষ, স্বতন্ত্র কর্তৃত্বশীল কর্তৃপক্ষ-নির্ভর করে তুলেছে, তাতে কেবল তাদের দাবীর চেয়ে বহুগুণ বেশিই তারা পায়নি, তাদের দাবীর দক্ষতা, প্যাঁচ, গভীরতাও বুঝা গেছে। এ যেন বাঘের (সন্তু গং) কাছে ছাগ শিশু (জাতীয় কমিটি)। সন্তু গং- এর রাতারাতি এই যোগ্যতা এলো কোথা থেকে? উত্তরে মনে হয়, সন্তু গং নিজেরা এই চুক্তির বিষয়াদির প্রস্তুত করেনি। তারা সম্ভবতঃ RAW এবং ভারতীয় অতিকুশলী আইনজ্ঞ বিষয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা এ কাজ করিয়ে এনেছে। যে সূক্ষ্ম কায়দায় পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৫টি ধারা ও বহুসংখ্যক উপধারা রচিত হয়েছে; যে কূট-কৌশলের সঙ্গে পার্বত্য চুক্তির 'গ' এবং 'ঘ' খণ্ড রচিত হয়েছে, তা যেমন একদিকে সন্তু গং ও আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ গং-এর নিজেদের রচনার সাধ্য নেই, তেমনি আবুল হাসনাত কমিটির তা বুঝারও সাধ্য নেই।

খুব সম্ভবতঃ গভীর কৌশল থেকেই চুক্তির প্রকৃত খসড়া প্রণেতারা ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধির reference রেখেছে। আর আবুল হাসনাতের কমিটি স্রেফ অজ্ঞতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা থেকে এসব কিছু চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করতে দিয়েছে। আবুল হাসনাতের কমিটির সদস্য না হলেও বাইরে থেকে চেপা-বসা একজন নটবর মাত্র কিছুদিন পূর্বে জাতীয় সংসদে অজ্ঞতাপ্রসূত অবস্থায় সরকারী দল ও নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একটি আইনে বিরোধীদের উত্থাপিত কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। অতঃপর সংসদে স্বদলের এমপিদের দ্বারা আপত্তি ওঠার মুখে তিনি তা বদলে ফেলতে চান, একটু আগে সংসদ ফ্লোরে ভোটে উত্থাপিত ও গৃহীত বলে ঘোষিত বিল বাতিল করার ও পুনরায় প্রস্তাব তোলার আবদার জানিয়ে। তখন স্বদলীয় স্পীকার তাকে জানিয়ে দেন যে, এটি পাশ হয়ে গেয়ে, আগে থেকে সাবধান হতে হবে, এখন আর কিছু করার নেই। এ খবর জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। আবুল হাসনাতের অজ্ঞতার সাথে লেজে-গোবরে মঞ্চ সংস্কৃতির সহযোগিতা তাই মূর্খতামুক্ত করতে পারেনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটিকে ও এর সম্পাদিত চুক্তিকে।

তদুপরি পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১১ধারা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ প্রণীত আইনের 'অসঙ্গতি' অনুধাবন ও দূর করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব ইচ্ছায় কিছুই করার নেই। যদি আঞ্চলিক পরিষদের বিবেচনায় তা আসে এবং যখন কেবলই তারা মনে করবে, তখন শুধু 'আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশ'ক্রমে ১৯৮৯ সালের আইনের অসঙ্গতি দূর করা হবে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — বিয়াল্লিশ

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১২ ধারায় হয়েছেঃ "পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্ববর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন"।

www.pathagar.com

এ থেকে দেখা যাচ্ছে, চুক্তি সম্পাদন করার সাথে সাথে এর সংসদ বিষয়ক দিকসমূহ, এর আইনগত দিকসমূহ, এর constitutional implications — কিছুই বিবেচনায় না এনে তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়ন করাই দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। জনসংহতি ও শান্তিবাহনী এ ব্যাপারে এতটুকু পুনর্বিবেচনার অবকাশ রাখেনি। পার্বত্য চুক্তির 'ক' খণ্ডের (সাধারণ) ৪ ধারা মোতাবেক এই চুক্তি 'সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ' হয়ে গেছে। আবার, এই পথে সন্তু লারমা ও চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জনসংহতি ও শান্তিবাহিনী এবং তাদের তাবেদার ব্যক্তিরাই যে নিশ্চিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের গদীতে বসবে, তাতে সন্দেহ নেই। তাই চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থাকৃত চরম অগণতান্ত্রিক আসন সংখ্যা, অসম অধিকার ও অসম সুযোগ-বন্টনেরও বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে একেবারেই বিনা নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল ক্ষমতার মসনদে বসে যাবার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এভাবে গোড়া থেকে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ এবং পরে অগণতান্ত্রিক-অসম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তারের সুযোগলাভের জন্যও এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ মিনিমাম প্রতিনিধিত্ব না করেও চরমভাবে ম্যাক্সিমাম পাওয়া গেছে, তেমনি মোটেই নির্বাচিত না হয়েও ক্ষমতায় বসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শান্তিবাহিনী যা ইচ্ছা চেয়েছে এবং সরকারও সংকীর্ণ ক্ষমতার স্বার্থে প্রতিবেশী মুরুব্বীকে খুশি করতে গিয়ে তাদের যাবতীয় হিংস্র ইচ্ছাকে অকাতরে পূরণ করেছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — তেতাল্লিশ

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১৩ ধারায় বলা হয়েছেঃ "সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ণ করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন"।

এ থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক —

(১) এখন হতে সরকার নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোনো আইন করতে পারবে না। এটি কি পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে সংবিধান বিরোধী স্পেশাল স্টেটাস নয়?

(২) সংবিধান মোতাবেক জাতীয় সংসদ সমগ্র বাংলাদেশের ব্যাপারে স্বীয় ইচ্ছায় আইন প্রণয়ন করবে। কিন্তু পার্বত্য চুক্তির পর বাংলাদেশের ৬১ জেলায় এ কথা খাটলেও পার্বত্য তিন জেলায় চলবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে স্বীয় উদ্যোগ ও দায়িত্বে আইন প্রণয়নের কোনো সুযোগ নেই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের । পার্বত্য চট্টগ্রাম কি বাংলাদেশের অবিভাজ্য অংশ নয়?

www.pathagar.com

(৩) সরকার যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোনো আইন করতে চায় তাহলে এর শর্ত হচ্ছে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে পূর্বেই কথা বলে এর মত নিতে হবে। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমেই' কেবল আইন করা যাবে। অর্থাৎ 'পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের ইচ্ছা ও প্রদর্শিত পথেই বাংলাদেশ সরকার কাজ করবে। এতে করে জাতীয় সরকারের স্থানীয় শাসন, 'প্রশাসনিক একাংশ' (সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ ধারা) বদলে গিয়ে এবং পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২ ধারানুযায়ী "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" বদলে গিয়ে তিন জেলার enhanced অবস্থা ও তাদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদ-এর অধিকার, মর্যাদা ও কর্তৃত্ব কি একটি বিশেষ আঞ্চলিক স্টেটাস বা প্যারালাল অথরিটির কথাই জানিয়ে দেয় না? বাংলাদেশ সংবিধানের preamble এর এককত্বের সূত্র এবং ১ ধারার প্রজাতন্ত্রের একক সার্বভৌম সত্তার চরিত্র কি এতে করে খণ্ডিত হয়ে বিনষ্ট হচ্ছে না?

(৪) আবার কেবল পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ যদি মনে করে এবং বাংলাদেশ সরকার মনে না-ও করে, তাহলেও পরিষদের ভাষায় "তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে" পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবে। এ কাজ হবে সরকার প্রণীত আইন পাল্টে ফেলার জন্যে অথবা নতুন আইন তৈরির জন্যে। এহেন বিশেষ মর্যাদা বাংলাদেশের অবশিষ্ট ৬১ জেলার বা অন্য কোনো অংশের নেই। সংবিধানেও স্থানীয় শাসনের এমন কর্তৃত্ব নেই। আর আঞ্চলিক পরিষদের তো কোনোই সূত্র নেই। তাহলে এমন কর্তৃত্বশীল বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত আঞ্চলিক পরিষদ কি বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের একক সত্তা, এর সরকারের একক সত্তা, এর জাতীয় সংসদের একক সত্তা, এর জাতীয় পরিচিতির একক সত্তাকে বিনষ্ট করছে না? 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল' বলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চুক্তিতে ঘোষণা দিয়ে সেখানকার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ শতকরা ৫০ ভাগ বাঙালী মুসলমানকে অস্বীকার করা হয়েছে। অউপজাতীয় বলে তাদের পরিচয় লোপ করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মূল বাঙালী ১১ কোটি ৯৫ লাখকে অপমান করে ৫ লাখ উপজাতি জনসংখ্যাকেই মূল পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এভাবে সংবিধান বিরোধী অঞ্চল চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের এককত্ব (oneness of the Republic) কে ধ্বংস করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর তৎকালীন এরশাদ সরকারকৃত ৭টি আঞ্চলিক হাইকোর্ট বেঞ্চ গঠন সংক্রান্ত মামলায় (সংবিধান অষ্টম সংশোধন মামলা) বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও প্রজাতন্ত্রের একক সাংবিধানিক ও আইনী কাঠামোর বিষয় দেশের সুপ্রীমকোর্টে স্বীকৃতি পেয়েছে, মীমাংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের তৎকালীন চীফ জাস্টিস বদরুল হায়দার চৌধুরী, পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতি জাস্টিস সাহাবুদ্দীন আহমেদ, পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান জাস্টিস হাবিবুর রহমান এবং আজকের চীফ

www.pathagar.com

জাস্টিস এ.টি.এম. আফজাল সেই ফুল বেঞ্চের বিচারক হিসেবে কাজ করেছেন। ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম, ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ব্যারিস্টার ড. কামাল হোসেন; এডভোকেট আশরারুল হোসেন, এডভোকেট খন্দকার মাহ্‌বুব উদ্দিন আহমেদ, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সেসময় একযোগে রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রের "এককত্ব" (oneness) নির্ধারণকারী বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনমুলক যে-কোনো আইন সংবিধান লঙ্ঘনকারী বলে কোর্টে আপত্তি তুলেছিলেন। আপীল বিভাগ (এ্যাপিলেট ডিভিশন) এদের যুক্তি গ্রহণ করে এরশাদকৃত অষ্টম সংশোধনের আওতায় সৃষ্ট ৭টি আঞ্চলিক হাইকোর্ট বেঞ্চ বাতিল করে দিয়েছিলো। এবং সরকারও তা মেনে নিয়েছিলো। আপীল বিভাগের মত ছিলো যে, রাষ্ট্রের এককত্ব রক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ঠভাগের (বিচার বিভাগ) ১ম পরিচ্ছেদের (সুপ্রীম কোর্ট) ১০৬ অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার (Advisory jurisdiction of Supreme Court) প্রসঙ্গে বিধান রয়েছে এরূপঃ

"যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যাহা একক ধরনের ও এমন গুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন"।

এক্ষণে রাষ্ট্রপতির কাছে সরকার পার্বত্য চুক্তির কপি দিয়েছে। সরকার প্রধানও বলেছেন যে, রাষ্ট্রতির হাতে বিবেচনার বিষয় রয়েছে। সরকার প্রধান যদিও কেবল সংসদ ডাকার বিষয়টি তুলেছেন, তথাপি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্রপতির সুযোগ আছে পার্বত্য চুক্তির বিষয়টি আপীল বিভাগে পাঠানোর।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — চুয়াল্লিশ

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১৪ ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে কর আরোপ ও তহবিল গঠন প্রশ্নে বিশাল ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার তিন পরিষদকে ১৯৮৯ সালের আইনের ৪৪ ধারার (পরিষদ কর্তৃক অরোপনীয় কর ইত্যাদি) সাথে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় তফসিল মোতাবেক ৮ টি বড় খাত থেকে কর, রেইট, টোল, ফিস আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে এবার পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৫ ধারা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের আইনের দ্বিতীয় তফসিলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'ক' থেকে 'ঠ' পর্যন্ত শিরোনামায় মোট আরো ১২ টি বড় কর খাত। এভাবে জাতীয় সরকার তিন পার্বত্য অঞ্চলে কর আরোপ প্রশ্নে ও তহবিল প্রশ্নে প্রায় ক্ষমতাশূন্য হয়ে পড়েছে। এর উপর পার্বত্য চুক্তির

www.pathagar.com

'গ' খণ্ডের ১৪ ধারায় পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠনের জন্যে যে ৭ টি দফায় সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাতে করে সরকারের হাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থ, কর, তহবিলে প্রশ্নে আর কোনো ক্ষমতাই বলতে গেলে থাকে না। এছাড়া এরকম আঞ্চলিক পরিষদ দেশের অন্য কোথাও নেই এবং এমন ক্ষমতাও কাউকে দেওয়া হচ্ছে না। তাই জিজ্ঞসা এক দেশে দুই বিধান কেন করা হচ্ছে?

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১৪ ধারা মোতাবেক নিম্নোক্ত উৎস থেকে তহবিল গঠন করবেঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ"।

উপরে উদ্ধৃত 'ক' উপধারাটি ফেডারেল বা কনফেডারেল কাঠামোর স্মারক। আবার 'চ' উপধারাটি স্পেসিফাইড না হওয়ায় নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ 'পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ'-এর আওতায় ভারতীয় অর্থ, 'Raw' এর রূপী অথবা অন্য কোনো বহির্দেশীয় আগ্রাসী শক্তির পরিকল্পনামাফিক প্রদত্ত অর্থও কি আসতে পারবে? বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে যে, জনসংহতি ও শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সংযোগ — ভারতের আশ্রয় অর্থ, অস্ত্র, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, কৌশল, সামরিক সাপোর্ট, গোলাবারুদ, বুদ্ধি-পরামর্শ, নির্দেশনা, প্রপাগান্ডা ইত্যাদি যেহেতু আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, সে কারণে ভারত নির্ধারকও বটে। তাই আঞ্চলিক পরিষদের 'চ' খাতের অর্থ প্রাপ্তির উৎসটি এক্সট্রাটেরিটোরিয়াল ভারতীয় বা অন্য যে কোনো যোগাযোগকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — পঁয়তাল্লিশ

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডে ১৯ টি ধারা এবং উপধারা রয়েছে। 'ঘ' খণ্ডের ১ ধারা অনুযায়ী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ০৯ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় বাংলাদেশ সরকারের আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা-ও জানা গেল। কেননা ইতঃপূর্বে সরকার এটি জনগণকে জানায়নি। যাহোক, ১ ধারা অনুযায়ী ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের জনসংহতি সমিতির সহযোগিতায় পুনর্বাসন করা হবে।

www.pathagar.com

এখানে কারা শরণার্থী, কতজন শরণার্থী — এসব স্থিরীকরণে জনসংহতি তথা শান্তিবাহিনী ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি আপারহ্যান্ড পেয়ে যাবে। ১৯৭১ সালের পূর্বে চলে-যাওয়া উপজাতীয়দের ফেরৎ আনার কথা নয়। তারা এদেশে জমি-বাড়ী-সম্পদ বিক্রি করে ভারতে চলে গেছে। তারা তথাকার অধিবাসী, নাগরিক এবং ভোটারও হয়েছে। তাদেরকে এখন বাংলাদেশে push back করা হবে। এছাড়া ভারতীয় চাকমাদের যদি এদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্যে এবং এখানে একক চাকমা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রাধান্য তৈরির জন্যে, তাহলে কি হবে?

তদুপরি 'ঘ' খণ্ডের ১ ধারা অনুযায়ী "তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হয়েছে, তার ফলে স্বেচ্ছাকারী ক্ষমতা পাবে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী নেতৃত্ব, তিন জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নামে তিন পার্বত্য জেলার যেখানে সেখানে বাঙালী উৎখাত হবে, বহিষ্কার হবে উপজাতীয় পুনর্বাসনের প্রয়োজনে। "উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল" থেকে এভাবেই বাঙালী নয় বরং সরকার প্রদত্ত অপমানজনক উপাধিধারী "অ–উপজাতীয়"রা বিতাড়িত হবে।

এছাড়া 'ঘ' খণ্ডের ২ ধারা অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু করে বিরোধ নিষ্পত্তি করা; উপজাতীয়দের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার বিধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উপজাতীয়রা যে কেবল নতুন নতুন দখল নেবে তা-ই নয়, উল্টোদিকে বাঙালীরা যে জমিহারা হবে তা-ও নিশ্চিত। কেননা তাদের ভূমি রেকর্ডভুক্তকরণ ও ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণের কথা চুক্তিতে নেই। যেন বাঙালীরা সবাই জবরদখলকারী এবং তাদেরকেই কেবল চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় উৎখাত করতে হবে।

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ৩ ধারা মোতাবেক "সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে"।

এখানে লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত ব্যবস্থায় কেবল উপজাতীয়রা অন্তর্ভুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ শতকরা ৫০ ভাগ বাঙালীকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। পার্বত্যবাসী বাঙালী ভূমিহীনকে, ২ একরের কম জমির মালিক বাঙালী পরিবারকে কিছুই দেওয়ার বিধান নেই। একেই কি বলে গণতন্ত্র, সংবিধানসম্মত ব্যবস্থা? সংবিধানের মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্র ও আইনের চোখে সমঅধিকার এখানে কোথায় থাকলো? এসব কি শান্তিচুক্তি? এরই নাম কি সরকার ও শান্তিবাহিনী কথিত ভাইয়ে-ভাইয়ে শান্তিতে থাকা? নিজ দেশে বাঙালী মুসলমানকে পরবাসী করে পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রামে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে, সেখানে তাদেরকে অনিশ্চয়তা দিয়ে ও বিপদে ফেলে, সেখান থেকে, তাদের নিজেদের জমি ও সম্পদ থেকে উৎখাত ও বহিষ্কার করেই কি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক আওয়ামী লীগ সরকার? এমন শান্তি ও সমতার পক্ষেই কি সরকার প্রধান, কমিটির নেতা, সরকারী দলনেতা, দলের সাধারণ সম্পাদক, মন্ত্রীবর্গ, দলীয় ধামাধরা সংবাদপত্র ও চাটুকার সুযোগ-সন্ধানী বিবৃতিজীবীরা ওকালতি করছে? কেন তারা মিথ্যাচার ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে? চুক্তির সামান্যতম রেফারেন্স না দিয়ে, এতটুকু যুক্তি ও সততার ধার না ধেরে তারা কীভাবে স্রেফ 'চাপাবাজির' উপর, গোয়েবল্‌সীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে গায়ের জোরে রেডিও-টিভিতে, দলীয় ও সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায় আর পুলিশ–পাহাড়ার জনসভায় চুক্তির কারণে সারা দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে দেখছে? আদতে চুক্তির বিরোধিতাকারীরা শান্তির বিরোধী নয়, সমস্যা সমাধানের বিরোধী নয়। শান্তির নামে দাসখতের, 'দেশ বিক্রি'র চুক্তি বিরোধী তারা। কিন্তু সরকার বিরোধীরা জনসমক্ষে এমন কথাই তুলে ধরেছেন। সরকার সংঘাত ও চরম দমনের পথ বেছে নিয়েছে।

একইভাবে পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের শর্তানুযায়ী ভূমি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠনের মাধ্যমেও কেবল উপজাতীয়দের স্বার্থ একতরফা রক্ষার ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে। অবৈধ বন্দোবস্ত ও বেদখল বাতিলের ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপীল চলবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফ্রীঞ্জ ল্যান্ড (জলে ভাসা জমি)–এর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। এই ল্যান্ড কমিশনের কম্পোজিশন দেখলেও বুঝা যায়, এর ভিতর উপজাতীয়দের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব থাকবে ('ঘ' খণ্ডের ৫ ধারা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্যে ৬ ধারা দ্রষ্টব্য)। এখানে দেখা যাচ্ছে, চুক্তি মোতাবেক উপজাতীয়রাই বিরোধ নিষ্পত্তির, অবৈধ বন্দোবস্ত ও বেদখল মুক্তির সুযোগ পাবে। বাঙালীদের উৎখাত করা হবে ঐ সকল পর্যায়ে। চুক্তিতে এতটুকু সুযোগ রাখা হয়নি বাঙালীর পক্ষে। এরই নাম কি ভাইয়ে-ভাইয়ে সহাবস্থান, সমতা? এরই নাম শান্তি প্রতিষ্ঠা? সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন কি এখানে লংঘিত হয়নি? রাষ্ট্র ও সরকার কি তাদের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি থেকে এসব ক্ষেত্রে সরে আসছে না? ল্যান্ড কমিশনের সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট), আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তার প্রতিনিধি, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট এর যে অবস্থান, কমিশনের কাজ-কারবার বা মেয়াদ প্রশ্নে আঞ্চলিক পরিষদের যে মাতব্বরী — এরপর আর কোনোই সুযোগ নেই যে-পথে বাঙালীরা সামান্যতম সমদৃষ্টি ও সুবিচার পাবে। এই হচ্ছে শান্তি চুক্তির স্বরূপ।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — ছেচল্লিশ

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ৭ ধারায় বলা হয়েছেঃ "যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত

www.pathagar.com

অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে"। আবার 'ঘ' খণ্ডের ১৬ ধারার 'ঘ' উপধারায় বলা হয়েছেঃ "জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে"।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছেঃ কার টাকা, কার আমানত কে মাফ করে, মওকুফ করে — একটি একটি গুরুতর প্রশ্ন। সরকারের কি এভাবে গণ সিদ্ধান্ত নিয়ে, শত শত কোটি কোটি টাকার দায় নেওয়ার সুযোগ আছে? তাছাড়া 'ঘ' খণ্ডের ৭ ধারা এবং ১৬ (ঘ) ধারা অনুযায়ী ঋণ গ্রহণকারী সকল উপজাতীয় লোকই এর আওতায় এসে পড়বে "বিবদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি" — এই অজুহাত তুলে এবং শান্তিবাহিনী ও উপজাতি নিয়ন্ত্রিত তিন জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের পূর্ণ সহায়তা এক্ষেত্রে তারা পাবে। অর্থাৎ সরকারের, ব্যাংকের, প্রতিষ্ঠানের শত–শত কোটি টাকা এরা আত্মসাৎ করলো। আবার ভারতে গিয়ে রিফিউজী হয়ে সুবিধা নিয়ে এখন আবার চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৬ ধারার 'ক' উপধারানুযায়ী পুনর্বাসনের মাধ্যমেও বিরাট অর্থ পাবে। ১৬ (ক)-তে বলা হয়েছেঃ "জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনে লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে"।

দেখা যাচ্ছে, এরা সরকারের, ব্যাংকের, প্রতিষ্ঠানের টাকা নিয়ে নানাভাবে মেরে দিচ্ছে। আবার খুন করার অপরাধে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে, অপহরণ-গুম-চাঁদাবাজি ইত্যাদির অপরাধে শাস্তি না দিয়ে তাদেরকে উল্টো সকল দিকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এভাবে এদের অর্থাৎ জনসংহতির সশস্ত্র সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া, বিচার, অনুপস্থিতিতে প্রদত্ত সাজা, জেলে আটক করে রাখা ইত্যাদি সব কিছু সর্ব অর্থে বিনাশর্তে মওকুফ করা হবে। এ যাবৎ অস্ত্রধারী খুনী কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা দেওয়া বা গ্রেফতার করা যাবে না। পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৬ ধারার 'খ' এবং 'গ' উপধারায় এসব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অথচ বাঙালীদের কোনো ঋণ বা সুদ মওকুফ করার ব্যবস্থা নেই, যদিও বিবদমান পরিস্থিতির অসুবিধা আসলে ছিল তাদেরই জন্যে প্রযোজ্য। চাঁদাবাজি, অপহরণ, লুট, গুম, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, খুনের শিকার হয়েছে বাঙালীরাই। উপজাতীয়রা ঋণ নিয়েছে ৫% হারে, বাঙালীরা ১৬-১৮% হারে। উপজাতীয়রা ট্যাক্স দেয়নি, বাঙালীদের দিতে হয়েছে। বাঙালীদের পুনর্বাসনের জন্যে এক টাকাও দেওয়া হবে না। অথচ তাদের অনেকে নির্যাতন, হত্যা, উচ্ছেদের শিকার হয়েছে। জমি, সম্পদ, দোকান, ব্যবসা ছেড়ে তাদেরকে মানবেতর গুচ্ছগ্রামে আসতে হয়েছে উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের পুনর্বাসনের স্বার্থে। আবার, বাঙালীদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া, অনুপস্থিতিতে বিচার, জেলের সাজা ইত্যাদি সবই বহাল থাকবে। পূর্বের ঘটনায় সংযুক্তির অভিযোগে

www.pathagar.com

ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু উপজাতীয়রা মুক্তি পাবে এ থেকে। হাজার হাজার কোটি টাকা লাগবে তাদের পুনর্বাসনের জন্য, জনসংহতির সদস্য প্রতি ৫০ হাজার টাকা করে দিলে। এছাড়া চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৬ ধারা মোতাবেক সরকার জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত সবাইকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে ছেড়ে দেবেন। অথচ মামলায় জড়িত বাঙালীরা ছাড়া পাবে না।

এদিকে নিজেরা চুক্তিমাফিক সকল undue সুবিধা হাতিয়ে নিয়ে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা বাঙালীদের সকল সমপাওনা থেকে বঞ্চিত করে ক্ষান্ত হয়নি। তারা চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ৮ ধারায় লিখিয়েছেঃ

"রাবার চাষ ও অন্যান্য জমি বরাদ্দঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্ল্যাটেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমির বন্দোবস্ত করা হইবে"। আবার, 'ঘ' খণ্ডের ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ধারা অনুযায়ী উপজাতীয়রা জমির দখলস্বত্ব, বন্দোবস্ত প্রশ্নে একচেটিয়া সুবিধা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বও আদায় করে নিয়েছে।

ইতঃপূর্বে দেখা গেছে, উপজাতীয়রা, জনসংহতির সদস্যরা সবাই বিবদমান পরিস্থিতির কারণে অপারগ হওয়ায় তাদের ঋণ মওকুফ, সুদ মওকুফ তো করা হচ্ছেই, উপরন্ত ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে জনপ্রতি। উপজাতি লোকেরা ১১-১৫ বছর ধরে ঋণ নিয়ে তা মেরে নিতে পারবে চুক্তি মোতাবেক আর বাঙালীরা রাবার চাষ ও অন্যান্য প্রয়োজনে জমি বরাদ্দ নিয়ে 'খ' খণ্ডের ৪ ধারা মোতাবেক 'অবৈধ বন্দোবস্ত ও বেদখল'-এর অভিযোগে তা হারাবে। আবার শান্তিবাহিনীর চাঁদাবাজি, অপহরণ, লুট, মারধোর, খুন ইত্যাদির মধ্যে এত বছর কাটিয়ে 'খ' খণ্ডের ৮ ধারার বিধান অনুযায়ী জমি হারাবে বাঙালীরা। তাই প্রশ্নে জাগে — এ কেমন বানরের পিঠা ভাগ? কেন এই নিকৃষ্টতম স্বেচ্ছাচারী অসম বিধান ও বৈষম্যমূলক আচরণকে সরকার চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছে? কোন বাধ্যবাধকতা সরকারের রয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসী খুনী মুষ্টিমেয়-নির্ভর অপ্রতিনিধি চক্রের কাছে আত্মসমর্পণ করার?

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — সাতচল্লিশ

পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম, এর তিন জেলায় উপজাতীয় কর্তৃত্ব সর্বত্র, নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। চাকরী, পদ, পরিষদগুলিতে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ও চেয়ারম্যান পদ, জমির মালিকানা — সব কিছুতে থাকবে তাদের চরম একাধিপত্য। তিন জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে থাকবে তাদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও চেয়ারম্যানের পদ। আঞ্চলিক পরিষদে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে থাকবে তাদেরই লোকজন ও কর্তৃত্ব। সেখানে চেয়ারম্যান পদে থাকবে উপজাতীয় ব্যক্তি।

www.pathagar.com

বাঙালী মুসলমানরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও, শতকরা ৫০ ভাগ হয়েও তথায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব তো দূরের কথা, এক-তৃতীয়াংশ পাবে কেবল। তা-ও নির্ভর করবে উপজাতীয়দের দেওয়া ক্ষণভঙ্গুর ও স্বেচ্ছাচারী 'অ-উপজাতীয়' সার্টিফিকেটের উপর। অথচ উপজাতীয়রা এ যাবৎ গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সারা দেশে সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে, ব্যবসায় ছাত্র বৃত্তিতে ও অন্য সকল ক্ষেত্রে 'কোটা'র সুযোগ নিয়ে নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অকল্পনীয়ভাবে এগিয়েছে। এখন এর উপর তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের জমি কেড়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে, চাকরী-ব্যবসা- সুযোগের ক্ষেত্রে বাঙালীদের ন্যায্য আনুপাতিক ব্যবস্থা দেয়নি, তিনটি জেলা পরিষদও আঞ্চলিক পরিষদে বাঙালীদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব রাখেনি, চেয়ারম্যান পদ কখনো বাঙালীরা পাবে না। সব কিছুতে অগ্রাধিকার পাবে উপজাতীয়রা। এসবই করেছে তারা চুক্তি মারফৎ।

অথচ চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১০ ধারায় উপজাতীয়রা পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে দেশে তাদের জন্যে অতি বেশি সুযোগের 'কোটা' ব্যবস্থার বিধান করেছে। ১০ ধারায় বলা হয়েছে, কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থা থাকবে উপজাতীয়দের জন্যে। তারা সরকারী চাকরী ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা পাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্যে সরকার অধিকসংখ্যক বৃত্তি প্রদান করবে। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্যে সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করবে তাদেরকে। লক্ষণীয় যে, পার্বত্য চুক্রি সকল টার্মই ডিক্টেট করেছে উপজাতীয় শান্তিবাহিনী ও জনসংহতি। তারা বানরের পিঠা ভাগ করেছে। নতজানু ভারত-নির্ভর সরকারের সুযোগে তারা সরকারকে দিয়ে যা-ইচ্ছা গিলিয়েছে। সকল কিছুই হয়েছে কেবল তাদের ইচ্ছায়, তাদের পক্ষে, তাদের স্বার্থে এবং দেশ-সংবিধানের বিরুদ্ধে, এ দেশের মূল জনগোষ্ঠী বাঙালী মুসলমানের বিরুদ্ধে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী মুসলমানের সাথেই নয় শুধু, বরং সারা দেশের সাথে সামন্ত প্রভুর ন্যায় আচরণ করেছে শান্তিবাহিনী। স্পষ্টতঃই এই চুক্তি নামক তামাশা সর্ব অর্থে দেশদ্রোহী এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও তাৎপর্যনির্ভর। এর সঙ্গে যুক্ত আছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আগ্রাসী স্বার্থ ও পরিকল্পনা।

এছাড়াও পার্বত্য চুক্তিতে উপজাতীয়দের একচেটিয়াভাবে বহু সুবিধা দেওয়া হয়েছে। চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৬ ধারার (ঙ) উপধারায় বলা হয়েছেঃ "প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব-স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে"।

পার্বত্য চুক্তির ১৬ ধারার (চ) উপধারায় বলা হয়েছেঃ "জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে"। অর্থাৎ তারা একবার

www.pathagar.com

ব্যাংক ঋণ নিয়ে ফেরৎ না দিয়ে তা সুদসহ সম্পূর্ণ মওকুফ করলো ('ঘ' খণ্ডের ৭ এবং ১৬-ঘ ধারা দ্রষ্টব্য)। তারা বাঙালীদের সেই সুযোগ এতটুকু দিলো না। উপরন্তু তাদের উপর খড়্গ নামালো জমি কেড়ে নেবার ('খ' খণ্ডের ২৬ ধারার ক, খ, গ, ঘ উপধারা মোতাবেক এবং 'ঘ' খণ্ডের ৪ এবং ৮ ধারা মোতাবেক)। আর ওদিকে 'ঘ' খণ্ডের ১৬ (চ) ধারা অনুযায়ী আগের ঋণ ও সুদ মেরে দিয়ে আবার 'সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার' লাভের অধিকার নিজেদের জন্যে আদায় করে নিলো। এ কেমন সমতা চুক্তি? এ কেমন ভাইয়ে-ভাইয়ে মীমাংসা? কীভাবে সরকার, সরকারী দল ও চাটুকাররা তারস্বরে চেঁচিয়ে এমন নির্জল অসত্য উচ্চারণ করছে যে, পার্বত্য চুক্তি, মোতাবেক উপজাতীয় বাঙালীদের সম-অধিকার, সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে? চুক্তিতে তো 'বাঙালী' শব্দটিই নেই। সন্তুদের ইচ্ছায় বাঙালী লুপ্ত হয়ে উপজাতীয়দের করুণা-নির্ভর 'অ-উপজাতীয়' সৃষ্টি হয়েছে। এরপরও চুক্তির পক্ষে সাফাই গাওয়া চলে?

আবার, পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৬ ধারার (ছ) উপধারা অনুযায়ী বলা হয়েছেঃ "জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইহতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে"। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, জনসংহতি ও শান্তিবাহিনী পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরামে পড়া তাদের উপজাতীয় সন্তানদের তথাকার বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট কোনোরূপ প্রশ্ন ও যাচাই ছাড়া মেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করিয়েছেন চুক্তি মারফৎ। তারা গাছেরটি খাবে, তলারটি কুড়াবে, অন্যের ভাগ থেকে কেড়ে নেবে, অন্যের পকেট কাটবে, অন্যের ন্যায্য পাওনা সর্বস্ব লুট করে নিজেরা সমৃদ্ধ হবে। আর মুখে বলবে শান্তির কথা। এই না হলে শান্তিবাহিনী। আর এই না হলে পার্বত্য চুক্তি। এমন চুক্তি সভ্য জগতে কেউ কখনো দেখেনি, শোনেনি। নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা ও তুরস্কে কুর্দীদের উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। শ্রীলঙ্কার ১৩% তামিলদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কলম্বো তাদের সমস্যা কিভাবে ডীল করছে। ভারতের কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গুর্খাল্যাণ্ড, আসামের সাত বোনের এত বড় অঞ্চল ও এত বড় বড় জনসংখ্যার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি ভারতের আচরণ এত কঠোর কেন? আয়ারল্যান্ড বা অন্য কোনো স্থানের উদাহরণ যারা বাস্তব অবস্থা, পূর্বাপর পরিস্থিতি না বুঝে দেন; যারা চোখ-কান বুজে স্বার্থ উদ্ধার প্রেরণার কোরাস তোলেন, তারা গর্দভ না জ্ঞানপাপী তা পাঠক বিচার করবেন। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মোট জনসংখ্যার আধা পার্সেন্টের আধারও কম। তাই পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে পক্ষের প্রচারে যে সত্যের লেশমাত্র নেই তা এই চুক্তির প্রকৃত পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন। আর সংবিধান, সংশ্লিষ্ট আইন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতা, এ অঞ্চলের ভূ-রাজনীতি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বার্থ চেতনা ও সমর-কূটকৌশল সম্পর্কে যদি কারো গভীর ধারণা থাকে, তবে তিনি তো নির্ঘাৎ বুঝতে পেরেছেন পার্বত্য শান্তিচুক্তির নামে কোন্ মরণ ফাঁদ বাংলাদেশের কণ্ঠ ও শ্বাসনালী চেপে ধরেছে।

www.pathagar.com

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৭ ধারার (খ) উপধারায় এত কিছুর পরও আরো বিধান করা হয়েছে যেঃ "সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকদের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে"। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও শেষাবধি একচেটিয়া লাভ হাসিল হবে উপজাতীয়দের।

আবার পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৮ ধারা অনুযায়ী বিধান করা হয়েছে যে "পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী আধা–সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে"। এছাড়া উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সরকারের সকল প্রচেষ্টা, প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে চুক্তি 'ঘ' খণ্ডের ১১ ধারা মোতাবেক।

পার্বত্য চুক্তি করে সরকার উপজাতীয়-অউপজাতীয়দের মধ্যে শান্তি ও সমতা এনেছেন, সম সুযোগ দিয়েছেন বলে দাবী করেন। বলেন তারা যে, এই চুক্তির সমালোচকরা 'ডাহা মিথ্যা কথা' বলছেন। বাস্তবে 'ডাহা মিথ্যা কথা' কারা বলছেন, তা সচেতন পাঠকমাত্রই বুঝতে পারছেন।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — আটচল্লিশ

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডে ৯ ধারায় বলা হয়েছেঃ "সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন"।

জনসংহতির সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন শান্তিবাহিনীর এবং জনসংহতির সাথে সংযুক্ত পিসিপি, হীল, ওমেন এসোসিয়েশন — এরা সব ২৫ বছর ধরে একটানা দেশদ্রোহী কাজ করা সত্ত্বেও ভারতের আশ্রয় ও সাহায্য নিয়ে চোরাগুপ্তা আক্রমণ চালানো সত্ত্বেও; এত চাঁদাবাজি, হয়রানি, মারধোর, স্যাবোটেজ, অপহরণ, লুটপট, ধর্ষণ, গুম, খুন, করা সত্ত্বেও; হাজার হাজার বাঙালী মুসলমান হত্যা করা সত্ত্বেও; অনেককে জায়গা-জমি-সম্পদ-ব্যবসাচ্যুত করা সত্ত্বেও; বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, বিডিআর ও অন্যান্য ফোর্সের এত শত শত সদস্য হত্যা করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সরকারগুলি — জিয়াউর রহমানের সরকার থেকে শুরু করে আজ অবধি — পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য অভূতপূর্ব কাজ করেছে এবং অগ্রগতি এনেছে। সরকার নিজে করেছে, স্থানীয় প্রশাসন দিয়ে করিয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড দিয়ে করিয়েছে সেনাবাহিনী দিয়ে করিয়েছে, পার্বত্য জেলা পরিষদ দিয়েও করিয়েছে।

www.pathagar.com

এসবের ফলেই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশাল রোড নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। নাজিরহাট-ফটিকছড়ি-জালিয়াপাড়া–খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়ক তৈরি হয়েছে — ১৬০ কিলোমিটার। করের হাট-হেইয়াকো -রামগড়-জালিয়াপাড়া সড়ক হয়েছে — ৪৩ কিলোমিটার। দীঘিনালা-ম্যারিস্যা সড়ক হয়েছে — ২৩ কিলোমিটার। রাঙামাটি-মানিকছড়ি-মহালছড়ি-খাগড়াচড়ি সড়ক হয়েছে — ৫৮ কিলোমিটার। গুইমারা-সিন্দুকছড়ি-মহালছড়ি সড়ক হয়েছে — ১৯ কিলোমিটার। চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়ক হয়েছে — ৫৫ কিলোমিটার। খাগড়া-বরইছড়ি-কাপ্তাই সড়ক হয়েছে — ১৯ কিলোমিটার। কাপ্তাই-বাঙালহালিয়া-বান্দারবান সড়ক হয়েছে — ৪২ কিলোমিটার। কেরানীহাট-বান্দারবান সড়ক হয়েছে —১৯ কিলোমিটার। বান্দরবান-রুমা সড়ক হয়েছে — ৪৪ কিলোমিটার। ফাসিয়াখালি-আলিকদম সড়ক হয়েছে — ২৯ কিলোমিটার। রামু-রাইক্ষ্যংছড়ি সড়ক হয়েছে — ১২ কিলোমিটার। এছাড়া সেনাবাহিনী আরো তৈরী করে দিচ্ছেঃ চিম্বুক-থানছড়ি সড়ক — ৪৪ কিলোমিটার। নতুন করে দীর্ঘিনালা-মারিস্যা সড়ক — ২৩ কিলোমিটার। পানছড়ি-গৌরঙ্গপাড়া সড়ক — ১৪ কিলোমিটার। মাটিরাঙা-তালাক্কাপাড়া সড়ক — ৪৪ কিলোমিটার।

আজকে দুই দশকেরও অধিক কাল ধরে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা, অর্থ ব্যয় ও চেষ্টার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমারা ৭২% সাক্ষর। অথচ তথাকার বাঙালীদের সাক্ষরতার হার ১০%। কারো মতে, আরেকটু বেশি। বিশেষ কোটার সুবিধা নিয়ে গত দু'দশকের অধিক কাল ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, এগ্রিকালচারাল কলেজ, এগ্রো ডিপ্লোমা কলেজ (নোয়াখালী), ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, সরকারী সাধারণ কলেজে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ভর্তি হতে ও পড়ালেখা করতে পেরেছে। বিশেষ কোটায় সরকারী, আধা সরকারী-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রায় দেড় হাজার লোক চাকরী পেয়েছে সাধারণভাবে যোগ্যতানুযায়ী পদ পাওয়া ছাড়াও। জিয়া শাসনামলে ১৯৭৬ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড (CHTDB) আজ অবধি প্রজেক্ট স্কীমে ব্যয় করেছে ৬৩০.৮৮ কোটি টাকা। ১৯৯৩ সালের মধ্যেই ৭৫৩.২৬ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ নেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্রগামের তিন জেলা হেডকোয়ার্টার এবং ২৫ টি থানাতেই বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। সকল জেলা ও থানা হেডকোয়ার্টারে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনটি জেলা সদরে NWD সুবিধা দেওয়া হয়েছে। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে তিনটি ৫০ বেডের আধুনিক হাসপাতাল করা হয়েছে। ৩১ বেড়ের হাসপাতাল করা হয়েছে ৬ টি থানা সদরে। ১০ বেডের হাসপাতাল করা হয়েছে ১০ টি থানা সদরে। তিনটি জেলা সদরে তিনটি চমৎকার স্টেডিয়াম তৈরী করা হয়েছে। ১৯৯৩ পর্যন্ত তিনটি সরকারী কলেজসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১ টি কলেজ, ১২৬ টি সেকেন্ডারী ও জুনিয়র হাইস্কুল, ১০২৬টি প্রাইমারী স্কুল, ৯ টি উপজাতীয় ছাত্র হোস্টেল, ৪ টি উপজাতীয়

www.pathagar.com

হোস্টেলসহ রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এবং রাঙামাটিতে একটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার গড়া হয়েছে। হাজার হাজার উপজাতীয় লোককে অটোমোবাইল, ড্রাইভিং কার্পেনট্রি, ইলেকট্রিক ফিটিং, সিউইং ও অন্যান্য ব্যবসা-পেশার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৭৫৯৪ টি শরণার্থী পরিবারের ৩৬৯১৩ জন সদস্যকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এদেরকে চাকরী, জমি, নগদ টাকা, ঢেউটিন, হালের বলদ, বস্ত্র, খাদ্য, কৃষিঋণ মওকুফ, পূর্বের স্ব স্ব পদে বহালসহ নানাবিধ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের হিসাব মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে গত ক'বছরে উন্নয়নের এক খণ্ডচিত্র। এছাড়া উপজাতীয় একাডেমী, সার্কিট হাউস, মিলনায়তন, বাজারসহ আরো গুরুত্বপূর্ণ নানা বিশাল স্থাপনাসহ এগুলির আনুষঙ্গিক সুযোগও পার্বত্য উপজাতীয়দের দেওয়া হয়েছে।

এত অভূতপূর্ব উন্নতি করা হয়েছে দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগের অর্ধেকেরও কমের জন্য। এসব সত্য লুকিয়ে রেখে কীভাবে শান্তিবাহিনী এবং সরকারী পক্ষভুক্তরা বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নতি হয়নি, তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে?

তদুপরি বর্তমান পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ৯ ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের বিশাল বোঝা ও তার আর্থিক দায় চাপানো হয়েছে সরকারের ঘাড়ে। সরকার গত ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭-এর চুক্তি করার পরপরই দাতাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে পার্বত্য চট্টগামে উন্নয়নের সাহায্য আদায়ের জন্য। বিশ্বব্যাংক, এডিবি'র সঙ্গে কথা বলেছে সরকার। সরকার জনসংহতিকে তাদের পরিকল্পনা ও দাবী জানাতে বলেছে এবং তারা তা করেছে। সরকার ৪৬০ কোটি টাকা ইতোমধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন। একনেকের মিটিং এবং ক্যাবিনেটের মিটিং করে নানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে অচিরেই টেলিকমিউনিকেশন খাতে। একথা অফিশিয়ালী জানিয়েছেন টেলিমন্ত্রী নাসিম। পার্বত্য চট্টগ্রামে এক মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র এবং এক বছরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাঈদ। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। একথা জানিয়েছেন এল জি আর ডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমান। সে মোতাবেক কাজ শুরু হয়েছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আরো অর্থ দিতে চাচ্ছেন। সরকার পক্ষীয়রা বলছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য চুক্তিতে সামান্যই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আরো বহু দিতে হবে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আরো উন্নতির লক্ষ্যে আরো ফান্ড দিতে বলেছেন। এসব খবর নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর সংবাদ এবং সরকার সমর্থক পত্রিকা দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক আজকের কাগজ, দৈনিক সংবাদ — ডিসেম্বর ১৯৯৭-এর সংখ্যাগুলি থেকে। ৪৬০ কোটি টাকা ব্যয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে ২১-১২-৯৭ এর রাত ১০ টায় টিভি সংবাদে। এসব উন্নয়নের কোনো ক্ষেত্রেই বাঙালীদের স্থান নেই। মনে হচ্ছে, সন্তু লারমা এবং তার জনসংহতি ও শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের নামে তাদের জন্যে আরো বহু অর্থ, সুযোগ ও সার্ভিস আদায় করে নেবে রাতারাতি, গরীব বাংলাদেশের অন্যান্য

www.pathagar.com

অঞ্চলকে বঞ্চিত করে বিশেষভাবে আনুগত্যশীল সরকারের উপস্থিতিতে। অতঃপর পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিতব্য পূর্ণাঙ্গ বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র থেকেই একদিন প্রতিবেশীর সমর্থনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন করার ঘোষণা যদি দেওয়া হয় তবে অবাক হবার কিছুই থাকবে না। কাশ্মীরের ফারুক আবদুল্লাহ এবং সিকিমের লেন্দুপ দর্জির মতো চরিত্র বাংলাদেশেও দেখা যাচ্ছে। তারা যে এক্ষেত্রে 'যথাযথ কাজ' করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — ঊনপঞ্চাশ

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১২ ধারায় বলা হয়েছেঃ "জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলোবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন"।

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৩ ধারায় বলা হয়েছে, "সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে"।

১২ ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে, জনসংহতি সমিতিই এককভাবে তাদের সশস্ত্র সদস্যদের তালিকা দেবে। সরকারের বা সেনাবাহিনীর কিছু করার নেই এক্ষেত্রে। এখন যদি জনসংহতি শান্তিবাহিনীর সকল সশস্ত্র সদস্যের তালিকা এবং তাদের অস্ত্র ও গোরাবারুদের প্রকৃত সংখ্যা ও পরিমাণের সন্ধান না দিয়ে ইচ্ছেমতো একটি তালিকা দেয়, তাও মেনে নিতে হবে। আবার, ভারতে ত্রিপুরা ও মিজোরামে যত সশস্ত্র বিদ্রোহী আছে, তাদের সবাইকে কি ভারত এবং ভারতীয় RAW ফিরে আসতে দেবে নিজেদের কন্ট্রোলমুক্ত পরিবেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে তৈরি করার জন্য? এছাড়া আগরতলায় আশ্রয় লাভকারী সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপের ভূমিকা কি হবে?

আবার পি সি পি, পি জি পি, হীল ওমেন্স ফেডারেশন — যে তিনটি সংগঠন শান্তিবাহিনীর জনসংহতির সংযুক্ত সংগঠন হিসেবে এতদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, তাদের পক্ষে পিজিপি-এর সাধারণ সম্পাদক প্রসিত বিকাশ খীসা শান্তিচুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এটি একটি আপসের দলিল; এতে তাদের সংগঠনের প্রতিনিধি ছিল না; এবং এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আনবে না। পত্র-পত্রিকায় প্রসিত বিকাশ খীসার বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। পাহাড়ী গণপরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সমীরণ চাকমা বিবিসি-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে চুক্তি বিষয়ে হতাশা

www.pathagar.com

প্রকাশ, অনন্ত বিহারী খীসা কর্তৃক চুক্তিকে স্থায়ী সমাধান নয় বলে চুক্তির ভবিষ্যৎ বিষয়ে শংকা প্রকাশ — এগুলিও হিসেবে আসবে। সমীরণ দেওয়ান বলেছেন যে, জনসংহতির সঙ্গে চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসবে না, কেননা তার ভাষায় মৌলিক বিষয়গুলিরই সমাধান হয়নি। এ চুক্তি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সন্তু লারমার আপোষ। এসব তথ্য নেওয়া হয়েছে আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, সংবাদ প্রভৃতি সরকার-সমর্থক পত্রিকা থেকে (ডিসেম্বর ১৯৯৭-এর বিভিন্ন সংখ্যা থেকে)। এছাড়া ইনকিলাব, দিনকাল, সংগ্রাম পত্রিকায়ও এসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে একই সময়ে। এমন হতে পারে যে, এরা চুক্তি মেনে নেয়নি সত্যিকার অর্থে এবং এরা আরো বেশি ছাড় তথা স্বাধীনতা চায়। সেক্ষেত্রে অস্ত্র সমর্পণে ঘাটতি থাকবে। শান্তিবাহিনী, জনসংহতি ও অঙ্গ সংগঠনগুলির অনেকেই হয়তো অস্ত্র জমা দেবে না। আবার এমনও হতে পারে, এদেরকে দিয়ে উপরোক্ত কায়দায় প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে। সমগ্র দেশবাসীকে বুঝানো হচ্ছে, শান্তিবাহিনী ও উপজাতীয়রা আরো অধিক চেয়েছিলো, কিন্তু তারা অত্যন্ত কমই পেয়েছে। অতএব বাঙালীদের চুক্তির বিরুদ্ধে যাবার মত কিছু নেই। এটি হতে পারে তাই একটি subtle tactical move। এদিকে বান্দরবান জেলার সাবেক এমপি উচ্চশিক্ষিতা রাজনীতিবিদ মিসেস ম্যা মা চিং এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "শান্তিচুক্তির সাংবিধানিক গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু তা বুঝতে পারছি না"। এই শান্তিচুক্তি অনুযায়ী কোটা ভাগের মেজোরিটি সুফল কেবল চাকমারা পাবে। তারাই থাকবে মূল নেতৃত্বে। ফলে চাকমা বাদে আমরা যারা আরও ১২টির মত উপজাতি রয়েছি পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা খুবই চিন্তিত (দৈনিক ইনকিলাব, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যা)।

যাহোক, জনসংহতি ও শান্তিবাহিনী যে পুরো অস্ত্র ও লোকবল সরকারের নজরে আনবে, তেমনটি মনে হয় না। লক্ষণীয় যে, চুক্তির পরও সন্তু লারমাসহ জনসংহতি ও শান্তিবাহিনীর নেতারা খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ি থেকে ভারতের ত্রিপুরায় তাদের আশ্রয়ে চলে গেছেন। (ভোরের কাগজ, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধির রিপোর্ট, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭)। সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সরকারী সূত্রও জানিয়েছে যে, অস্ত্র সমর্পণের আগেই নাকি শান্তিবাহিনী চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দেখতে চায়। এ বিষয়ে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় কমিটির প্রভাবশালী সদস্য আওয়ামী লীগের এমপি কল্পরঞ্জন চাকমা 'আজকের কাগজ'কে বলেছেন, "পার্বত্য শান্তিচুক্তির আইনী বৈধতা, প্রস্তাবিত পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তিনি বলেন, শান্তিবাহিনীর সদস্যরা চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া দেখেই অস্ত্র সমর্পণ করবে। তার আগে নয়" (আজকের কাগজ, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭)।

এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে, ৪৫ দিনের শর্তের অকার্যকরতা। আরো বুঝা যাচ্ছে শান্তিবাহিনী 'টোকেন' অস্ত্র সমর্পণ করলেও সকল অস্ত্র দেবে না। এর সকল সশস্ত্র সদস্যও তালিকাভুক্ত হয়ে সামনে আসবে না। তাহলে চুক্তির এত প্রচারিত 'শান্তি'র ভবিষ্যৎ কোথায়? আবার, পার্বত্য চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৪ (ক) ধারা মোতাবেক পার্বত্য

www.pathagar.com

তিন জেলায় পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে সকল নিয়োগ এবং পুলিশের পরিচালনা শান্তিবাহিনী-নিয়ন্ত্রিত পরিষদের হাতে গেলে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদেরই যে পুলিশের নিয়োগ দেওয়া হবে, এতে সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে অস্ত্র সমর্পণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রভুরঞ্জনমূলক নাট্যকলা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এছাড়া পার্বত্য উপজাতি নেতৃবৃন্দ যেভাবে নিত্য-নতুন দাবী তুলছে, তা-ও আশঙ্কাজনক। রাঙামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান তিন পার্বত্য জেলার জন্য পৃথক 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' দাবী করেছেন (দ্রষ্টব্যঃ ভোরের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭)। আবার পিজিপি, পিসিপি, এইচ. ডব্লিউ. এফ. পার্বত্যবাসীদের জন্য পৃথক 'জাতিসত্তা'র দাবী উঠিয়েছে (দিনকাল, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭)। বুঝাই যাচ্ছে শান্তিচুক্তির নামে সরকার কি অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — পঞ্চাশ

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৭(ক) ধারায় বলা হয়েছেঃ "সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময় সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন"।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে, সরকার, সরকারী দলনেতারা এতদিন অসত্য ভাষণ করেছে এবং এখনও করে চলেছে। পার্বত্যচুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সেনানিবাসে ও আরো তিনটি এসটাবলিশমেন্টে সেনাবাহিনী থাকবে। আর সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায় সাড়ে পাঁচশত ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে স্থায়ীভাবে এবং পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৭ (খ) ধারা মোতাবেক "সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে"।

বুঝা যাচ্ছে, সামরিক বাহিনী প্রায় সাড়ে পাঁচশত ক্যাম্প ছেড়ে দেবে চিরস্থায়ীভাবে। দুর্গম এলাকায়, স্ট্র্যাটেজিক ও অপারেশনাল দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৭৩টি হেলিপ্যাডযুক্ত ক্যাম্প ছেড়ে দেবে। এই হেলিপ্যাডের জমি উপজাতীয়রা পেয়ে যাবে। অতঃপর কোনো emergency হলে সামরিক বাহিনী চাইলেও — আগের মতো establishment,

www.pathagar.com

হেলিপ্যাড ও ক্যাম্প না থাকায় এবং পুরো বিস্তীর্ণ অঞ্চল সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় — দ্রুত ও কার্যকরভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবে না। তাছাড়া, এখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীন কেবল শান্তিবাহিনী-নিয়ন্ত্রিত আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজন ও সময় অনুভব-এর পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের অনুরোধের শর্তেই মাঠে নামতে পারবে। জাতীয় সরকার নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী অপারেট করবে আঞ্চলিক পরিষদের ইচ্ছায়। উপজাতীয় চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় চট্টগ্রামের জি.ও.সি. পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করবেন।

এভাবে সামরিক বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থান ও এখতিয়ার পার্বত্য চট্টগ্রামে চূড়ান্তভাবে হ্রাস করায় শান্তিবাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে, অস্ত্রের দাপট শুরু হলে (অস্ত্র চুক্তির মাত্র চার ঘন্টার মধ্যে সরকারী বন কর্মকর্তার অপহরণ থেকে শুরু করে চাঁদাবাজি, মারধোর, বাঙালী বহিষ্কার, জমি বেদখল, এ্যামবুশ, লুটপাট, প্রকাশ্য তাণ্ডব, স্যাবোটেজ, ধর্ষণ, গুম, হত্যা ইত্যাদি শুরু হয়ে গেছে। সূত্রঃ ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, সংবাদ, ইনকিলাব, দিনকাল, সংগ্রাম ইত্যাদি। ডিসেম্বর ১৯৯৭-এর সংখ্যাসমূহ) কীভাবে সেসব থামানো যাবে, নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে চলে আসার পর শান্তিবাহিনী একছত্র কর্তৃত্ব কায়েম করবে। ইতোমধ্যেই সে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং বহু বাঙালী নিগৃহীত ও বিতাড়িত হচ্ছে।

তাছাড়া সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর অনুপস্থিতিতে কেবল বিডিআর থাকলেও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের মিজোরামের ১৭৫.৮৬ কিলোমিটার সীমান্ত, ভারতের ত্রিপুরার সাথে ২৩৬.৮০ কিলোমিটার সীমান্ত এবং মায়ানমারের সাথে ২৮৮.০০ কিলোমিটার সীমান্তসহ মোট ৭০০.৬৬ কিলোমিটার সীমান্ত যথেষ্ট ভালনারেবল হয়ে পড়েছে। কেননা পাহাড়ী জঙ্গলপূর্ণ দুর্গম পথে রাতের অন্ধকারে একবার ভিতরে ঢুকলেই সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনী এবং তাদের পিছনে ভারতীয় বি.এস.এফ. বাংলাদেশে মিশন উদ্ধারে নিয়োজিত হতে পারবে। আবার নারাইছড়ি থেকে সাজেক পর্যন্ত ১২১.৮৭ কিলোমিটার, আদ্ধারমানিক থেকে মওডক পর্যন্ত ১৩১.২৫ কিলোমিটার এবং মওডক থেকে লেম্বুছড়ি পর্যন্ত ১০১.৪২ কিলোমিটারসহ মোট ৩৫৪.৫৪ কিলোমিটার BOP (অর্ডার আউটপোস্ট) ছাড়া বাংলাদেশের সীমান্ত আরো অভয়ারণ্য হয়ে উঠবে শান্তিবাহিনীর জন্য। এত উন্মুক্ত সুযোগ, ভারতীয় মিলিটারী কাভারেজ এবং পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন জেলা পরিষদে ও আঞ্চলিক পরিষদে শান্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর ত্রিপুরা ও মিজোরামের ঘাঁটিতে আশ্রিত শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা কিভাবে, কত বেশি মাত্রায় তৎপর হবে সীমান্তের ভিতরে-বাইরে থেকে নির্দেশ পেলে, তা সহজেই অনুমেয়। পার্বত্য চুক্তি তাই বাংলাদেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বিনষ্ট করবে।

www.pathagar.com

আবার, বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের (নির্বাহী বিভাগ) ৪র্থ পরিচ্ছেদের (প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ) ৬১ অনুচ্ছেদ বলা হয়েছেঃ "বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে"।

দেখা যাচ্ছে, সংবিধান অনুযায়ী প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা (Supreme Command) রাষ্ট্রপতির হাতে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকাণ্ড, এর প্রয়োগ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার কথা। অথচ সন্তু লারমাদের সাথে সরকারের সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে হলে তথাকার বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীন করতে হবে। আবার এই ক্ষেত্রে "প্রয়োজন বা সময়" নির্ধারণ করবে উপজাতি-নিয়ন্ত্রিত আঞ্চলিক পরিষদ। নিজেদের দরকার মতো সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে "সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন"। দ্রষ্টব্যঃ পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৭ (ক) ধারা।

এই ধারায় আরো বলা হয়েছে "আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে" সামরিক বাহিনী আঞ্চলিক পরিষদের "প্রয়োজন বা সময়" অনুভবের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে 'সহায়তা' দেওয়ার জন্যে তারই "অনুরোধ"-এ যাবে। এদিকে চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯ (গ) ধারা অনুযায়ী "তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান" করবে। তাহলে চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৭ (ক) ধারা অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের অনুরোধে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সামরিক বাহিনী গেলেও তা একান্তই চুক্তির দাবী অনুযায়ী উপজাতি-নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের অধীনস্থ হবে এবং সেই প্রশাসনের উপর সার্বিক কর্তৃত্ব থাকবে উপজাতি-নিয়ন্ত্রিত আঞ্চলিক পরিষদের। আবার চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯ (ঘ) ধারানুযায়ী "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা" করাটাও আঞ্চলিক পরিষদের এখতিয়ারে এবং এর সমন্বয় সাধনও করবে তারা। সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ত্রাণ কার্যের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করতে হলে আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে থেকেই করবে। আবার সেক্ষেত্রেও "প্রয়োজন বা সময়" নির্ধারণ এবং "অনুরোধ"-এর এখতিয়ার কেবলই আঞ্চলিক পরিষদের। এ-ও দেখা যাচ্ছে "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন" (চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১০ ধারা দ্রষ্টব্য)। এভাবে উন্নয়ন বোর্ডের উপজাতীয় চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণে এবং আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে — এ উভয় নিয়ন্ত্রণে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য হিসেবে চট্টগ্রাম এরিয়ার জি.ও.সি. কাজ করবেন। আবার পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯ (ক) এবং ৯ (গ) ধারানুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় উন্নয়ন, সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলাসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ও দায়িত্বে আঞ্চলিক পরিষদই

www.pathagar.com

একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক ও সমন্বয়কারী এবং এসব ক্ষেত্রে "আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে"।

লক্ষণীয় যে, পার্বত্য চুক্তির ফলে এখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী কখনো কোনো কাজে নামলে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে, এর ইচ্ছাতেই তা সম্পন্ন হবে। অথচ দেশের সামরিক বাহিনী পরিচালনা, তাদের অবস্থান, স্থায়ী-অস্থায়ী ক্যাম্প, তাদের মুভমেন্ট ও এর স্থায়িত্ব ইত্যাদি আইন অনুযায়ী জাতীয় সরকারের নিজস্ব এখতিয়ারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাধা হবার কথা। এক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর প্রধানের পরামর্শ গৃহীত হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী থাকবে কি-না; কোথায়, কতদিন, কোন্ অবস্থানে, কীভাবে থাকবে, সে সব সিদ্ধান্তের মালিক জাতীয় সরকার। অথচ পার্বত্র চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৭ (ক) ধারানুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে সন্তু লারমার শান্তি বাহিনীর দাবী মোতাবেক সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করা হচ্ছে; তাদের ক্যাম্প, সেনা ছাউনী তুলে দেওয়া হচ্ছে; তাদের দায়িত্ব পালনের পরিধি একেবারে শূন্য করা হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে দায়িত্ব পালনকালে সামরিক বাহিনীকে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হয়েছে। সরকার কেমন করে, কোন্ অধিকারে তার উপর সামরিক বাহিনী পরিচালনা করবার রাষ্ট্র প্রদত্ত এখতিয়ার ও ক্ষমতা চুক্তি মারফৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস্তবে খর্ব করতে সম্মত হলো? বাংলাদেশ সরকার সমগ্র বাংলাদেশেরই প্রতিনিধিত্ব করবে এবং সমগ্র রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থ দেখবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ হচ্ছে পুরো দেশের স্বার্থ। কাজেই পুরো বাংলাদেশের স্বার্থে এ দেশের সামরিক বাহিনীকে যখন যেখানে, যেভাবে, যতদিন, যে-কাজে আবশ্যক, ততদিন সেভাবেই সরকার কেবল নিজস্ব কর্তৃত্বে পরিচালনা করবে। অথচ চুক্তি মারফৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক বাহিনীকে যেভাবে গণহারে উইথড্র করা হচ্ছে এবং যেভাবে খুব সীমিত ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভবিষ্যতে কাজ করতে গেলে এদেরকে উপজাতি কর্তৃত্বাধীন আঞ্চলিক পরিষদের অধীন করা হয়েছে, তা মোটেও আইনসম্মত নয়, প্রয়োজন মেটাতে উপযোগী নয় এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীকী জাতীয় সামরিক বাহিনীর জন্য মর্যাদাজনক নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম কি অতি ক্ষুদে চাকমা গোষ্ঠীর (মোট জনসংখ্যার ০.২২ শতাংশ) উপর চেপে-বসা বিচ্ছিন্নবাদী ভারতে আশ্রিত সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনী ও সন্তু লারমাদের কাছে বন্ধক বা ইজারা দেওয়া হয়েছে? আর তাছাড়া সরকার, সরকারী দল ও ধামাধরাদের পক্ষ থেকে কীভাবে চুক্তির আগে তো বটেই এবং এমনকি চুক্তির পরেও নিরবচ্ছিন্নভাবে অসত্য ভাষণ করা হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোথাও কোনো পর্যায়ে সেনা প্রত্যাহার করা হবে না? কেন বলা হচ্ছে ক্যাম্প-সেনা ছাউনী সরানো হবে না? অথচ চুক্তি মোতাবেক ব্যাপকভাবে, বিশাল অঞ্চল থেকে সামরিক বাহিনী স্থায়ীভাবেই প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — একান্ন

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের' ১৯ ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করার কথা বলা হয়েছে। ১৯ ধারায় বলা হয়েছেঃ

"উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ
৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬) সাংসদ, রাঙামাটি
৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি
৮) সাংসদ, বান্দরবান
৯) চাকমা রাজা
১০) বোমাং রাজা
১১) মং রামা
১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য"।

প্রাথমিক একটি দৃষ্টি থেকে দেখা যাচ্ছে, গত ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭-এ সম্পাদিত ও সাথে সাথে বলবৎকৃত বলে ঘোষিত পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১০ নাম্বার ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারের অন্য যে-কোনো মন্ত্রণালয়ের মতো মোটেও নয়। এই পার্বত্য মন্ত্রণালয় ১০০% উপজাতীয় নিয়ন্ত্রিত এবং এর টার্মস অব রেফারেন্স কেবল তাদেরই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী। এর পরও যদি কেউ বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম খুব কৌশলে অথচ অতি পরিষ্কারভাবে বিচ্ছিন্নতার দিকে এগোচ্ছে না, তাহলে তিনি হয় বুদ্ধি-বিবেচনাহীন অথবা খাঁটি মতলবী। এখানে কিছু প্রশ্ন করা যায়। আওয়ামী লীগ সরকার কি সিলেট, নোয়াখালী, কুমিল্লা, রংপুর, খুলনার ব্যাপারে পার্বত্য চুক্তির মতো চুক্তি করতে বা পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মতো ক্ষমতা দিয়ে সিলেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় নোয়াখালী বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কুমিল্লা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খুলনা বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বীকার করে নিতে রাযী আছে? এছাড়া এসব স্থান যদি দাবী তোলে যে, তাদের জেলায়, বিভাগে কেবল তাদেরই কর্তৃত্ব থাকবে, তাহলে আওয়ামী লীগ সরকার কি তা-ও মেনে নেবে? যদি মেনে না নেয়, তাহলে ঐ সব অঞ্চলে শান্তিবাহিনীর মতো

www.pathagar.com

সন্ত্রাস কায়েম এবং প্রকাশ্য ও সার্বিক ভারতীয় যোগসাজশ প্রতিষ্ঠা করা গেলে কি আওয়ামী লীগ সরকার এবারের মতো নতজানু হয়ে আত্মসম্মান বিকিয়ে দিয়ে মেনে নেবে? তা যদি না মানে, তাহলে উল্লিখিত স্থানগুলির লোকসংখ্যার বিরাটত্ব ও দাবীর অনেক বেশি যৌক্তিকতার বিপরীতে শান্তিবাহিনীর মুষ্টিমেয় চাকমা সন্ত্রাসীর ও খুব ক্ষুদ্র এক জনগোষ্ঠীর অযৌক্তিক দাবীকে মেনে নিচ্ছে কেন? কেন তাদের জন্য স্থায়ীভাবে কেবলই তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয় থাকবে? আর যদি পূর্বোক্ত বিষয় মেনে নেয়, তাহলে বাংলাদেশের একক সংহত অস্তিত্ব থাকবে কি করে? শান্তিবাহিনীকে সরকার যেভাবে দেশের পার্বত্য অঞ্চলের জন্যে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তাতো কেবল তাদেরকে সুযোগ দেওয়া নয় ঐ অঞ্চলের উন্নয়ন দাবী মেটানোর জন্য, বরং তা স্পষ্টই পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যাভিসারী। এদিকে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের অনুকরণে "নোয়াখাইল্যা" মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার এবং "নোয়াখাইল্যাদের" মধ্য থেকে নিয়োগের দাবীও উঠেছে এবং পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। গারোরাও তাদের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার রক্ষার জন্য দাবী তুলেছে। খাসিয়া, মনিপুরী অধিবাসীদের পক্ষ থেকেও দাবী উঠেছে। সিলেটের পিভিশন সুসিয়াংসহ বাংলাদেশের নানা অঞ্চলের অধিবাসীরা ঢাকায় সভা-সেমিনার করে আধিবাসীদের দাবী তুলেছে (ডিসেম্বর ১৯৯৭-এর বিভিন্ন দৈনিকের রিপোর্ট, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, সাক্ষাৎকার থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এসব তথা আজকের কাগজ ভোরের কাগজ, সংবাদ, ইনকিলাব, দিনকাল, সংগ্রাম থেকে নেওয়া হয়েছে)।

অন্যদিকে দিয়ে বিচার করলে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যে স্থায়ী বিশেষ মন্ত্রণালয়ের ও মন্ত্রীর বিধান করা হয়েছে, তা বাংলাদেশ সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থভাগের (নির্বাহী বিভাগ) ২য় পরিচ্ছেদের (প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা) ৫৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে; "প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রীও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে"।

৫৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে; "মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবে"।

৫৬(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ "একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকিবেন"।

৫৬(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ "প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন"।

সংবিধানের দু'টি অনুচ্ছেদের চারটি উপ-অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছেঃ সংবিধানের সীমায় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা ও স্থিরীকরণই মন্ত্রী বাছাইয়ের ও মন্ত্রিসভা গঠনের শর্ত। প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করবেন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সেরূপ থাকবেন।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীসহ এদের সবার নিয়োগ রাষ্ট্রপতি দেবেন। এই যদি হয় সংবিধানের তিনটি দাবী, তাহলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে সন্ত্রাসীদের শান্তিবাহিনীর তথা সন্তু লারমার চুক্তির মাধ্যমে উপজাতীয়দের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগের বাধ্যতামূলক শর্ত চাপানো যায় কি? বাংলাদেশ সরকারও বা কেন এই অসাংবিধানিক দাবী কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, একেবারে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে স্বাক্ষর করে স্থায়ী বিধান করতে বাধ্য হচ্ছেন? কার চাপে? কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় কেবলই উপজাতি-নিয়ন্ত্রিত আকারে সমগ্র দেশের উপর চাপানো হচ্ছে সরকার বা প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজনে নয়, বরং কেবলই শান্তিবাহিনীর চাপের মুখে এবং তাও লিখিত চুক্তির বাধ্যবাধকতা রেখে? এমন মন্ত্রণালয় তো দেশের অন্য কোনো অঞ্চল নিয়ে গঠন করা হবে না। আবার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজাতীয় মন্ত্রী মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের সাথে যৌথভাবে জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী থাকবেন, নাকি তিনি চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী, দণ্ডমুন্ডের কর্তা পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন? তার নিয়োগ, স্থায়িত্ব ও সার্বিক অবস্থানগত ভবিষ্যৎ তো উপজাতীয় শান্তিবাহিনীর হাতে থাকবে। আবার এই মন্ত্রীর পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্যে গঠিত তথা আনুষ্ঠানিক ও কার্যকর অর্থে সর্বাধিক শক্তিধর উপজাতীয় সদস্য-নিয়ন্ত্রিত উপদেষ্টা কমিটির কাছেও জিম্মী হয়ে থাকবেন। এমতাবস্থায় পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৯ ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় মন্ত্রী, মন্ত্রণালয়, উপদেষ্টা পরিষদ এবং এদের জন্য চুক্তির শর্তানুযায়ী স্থায়ী অস্তিত্বের বাধ্যতা কতটুকু সংবিধান সম্মত?

আবার অঞ্চলভিত্তিক স্থায়ী মন্ত্রী, মন্ত্রণালয়, উপদেষ্টা পরিষদ, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ ইত্যাদির বিধান সংবিধানে না থাকলেও তা করে এবং এদেরকে বিশেষতঃ পার্বত্য মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বক্ষমতাময় ও সর্বেসর্বা করায় সংবিধান লঙ্ঘিত হয়নি বলে সরকার প্রধান দাবী করেছেন (সংবাদ, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, ডিসেম্বর ১৯৯৭)। তিনি ইতঃপূর্বে জিয়া শাসনামলে চাকমা উপদেষ্টা হিসেবে রাজমাতা বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা নিয়োগের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অথচ এক্ষেত্রে পার্থক্যটি হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে কেবল রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্থায়ী ইচ্ছায় জিয়াউর রহমান বিনীতা রায়কে অস্থায়ীভাবে তাঁর খুশীমতো উপদেষ্টা করেছিলেন, যেমন করেছিলেন এরশাদ উপেন্দ্র লাল চাকমাকে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার একটি লিখিত চুক্তির মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর চাপে স্থায়ীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে তাদের নির্ধারিত উপজাতীয় মন্ত্রী স্থায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা কমিটি তাদের শর্তে ও তাদের নির্ধারিত পথে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এখানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়ার যে স্বাধীন ইচ্ছা ছিল, সেটি নেই এবং

www.pathagar.com

এখনকার প্রধানমন্ত্রী বা ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রীর 'যেরূপ স্থির' করার, 'সেইরূপ' মন্ত্রী বাছাইয়ের, মন্ত্রণালয় সৃষ্টির অবকাশ নেই। এই বাধ্যতা, বিশেষ ব্যবস্থা, স্থায়ী শর্ত — এইসব সংবিধানের উপরে-উদ্ধৃত ধারাসমূহের বিরোধী। তাছাড়া এরূপ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় ও স্বেচ্ছা নির্ধারণে নয়, বরং উপজাতীয়দের লিখিত চুক্তির শর্তের বাধ্যতায় রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেবেন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় মন্ত্রীকে। এখানেও আপত্তি উঠতেই পারে।

আবার সরকার প্রধানের দাবী অনুযায়ী (সংবাদ, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭) বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগের ১ম পরিচ্ছদের (কর্ম বিভাগ)-এর আওতায় ১৩৬ ধারায় "আইন দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বিভাগসমূহের সৃষ্টি, সংযুক্তকরণ ও একত্রীকরণসহ পুনর্গঠনের" যে বিধান রয়েছে, সে মোতাবেক বর্তমানে বিদ্যমান "বিশেষ কার্যাদি বিভাগ"ও চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরূপ।

কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, "বিশেষ কার্যাদি বিভাগ" নিজে কোনো মন্ত্রণালয় নয়। এটি প্রধানমন্ত্রীর সরকারী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা করার জন্যে একটি সম্পূর্ণ অস্থায়ী বিভাগ মাত্র। এর কোনো মন্ত্রী নেই। এর মন্ত্রণালয়ের ন্যায় কোনো কাঠামো নেই। এর সঙ্গে কোনো আঞ্চলিক পরিষদ ও বিশেষ উপদেষ্টা পরিষদের যোগ নেই। এর কর্মকর্তা কেউ মন্ত্রিসভায় যোগ দেন না এবং মন্ত্রী সংক্রান্ত সাংবিধানিক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাদের নিয়োগ হয় না। এর কর্মকর্তারা রাষ্ট্রের বেসামরিক কর্মচারী মাত্র। তাই এক্ষেত্রেও বাস্তবে লংঘন করা হচ্ছে সংবিধান, প্রদান করা যাচ্ছে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ — বাহান্ন

০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তিচুক্তিটিই খোদ সংবিধান বিরোধী বলে প্রমাণিত। এই অবৈধ চুক্তির দায়-দায়িত্ব কখনও বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্র ও জনগণের উপর আসতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির ফুফাতো ভাই আহ্বায়ক ও ধামাধরা আরেক নেতার উপর দায়িত্ব ছিল জনসংহতির সন্তু লারমাদের সঙ্গে বৈঠক করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্যে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করা। অথচ কমিটির আহ্বায়ক চুক্তি করে সইও দিয়ে দিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষে। কমিটির টার্মস্ অফ রেফারেন্সের বা কাজের শর্তের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কমিটির কোনই ক্ষমতা ছিল না চুক্তি করার এবং তা স্বাক্ষরের সাথে সাথে বলবৎ হয়ে গেছে বলে চুক্তিতে লিখিতভাবে ঘোষণা দেওয়ার। অথচ কমিটি ঐ বেআইনী কাজটিই করেছে। কেন, কার ইচ্ছায়, কার চাপে?

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগের (প্রজাতন্ত্র) কোর্টে এনফোর্সেবল অনুচ্ছেদ ৭(১)-এ বলা হয়েছেঃ "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে"। ৭(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে"।

বাংলাদেশ সংবিধানের একাদশ ভাগের (বিবিধ) "চুক্তি ও দলিল" শীর্ষক অংশে ১৪৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ "প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাঁহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে তাহা সম্পাদিত হইবে"।

সংবিধানের ১৪৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ "প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না"।

এখন বাংলাদেশ সংবিধানের ৭(১) ও ৭(২) অনুচ্ছেদের এবং ১৪৫(১) এবং ১৪৫(২) অনুচ্ছেদের শর্তাদি মেনে নিয়ে বর্তমান পার্বত্য চুক্তিটি সম্পাদিত হয়নি, এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে এই ক্ষমতা কার্যকর করা হয়নি অর্থাৎ সংবিধানের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ মোতাবেক চুক্তি করা হয়নি। ১৪৫ অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী এই চুক্তি প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত হয়নি। এটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলে প্রকাশ করেনি সরকার। এটি রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বা তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সেইরূপ প্রণালীতে সম্পাদিত হয়নি। সংবিধানের ১ এবং ১৪৫(১) ও ১৪৫(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সম্পাদন ও প্রকাশিত নয় বলে পার্বত্য চুক্তিটি সংবিধান বিরোধী ও অবৈধ। আবার, বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের (নির্বাহী বিভাগ) ২য় পরিচ্ছেদের (প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা) ৫৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ "প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে"।

এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি কিংবা এই কমিটির আহ্বায়ক জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা ধারণ করেন না। কমিটির সরকারী ও বিরোধী সদস্য ব্যতিরেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহিউদ্দিনও সদস্য। দেখা যাচ্ছে, এই কমিটি বা কমিটির আহ্বায়ক

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও এর নির্বাহী ক্ষমতার অংশ নন। এদের সংবিধানসূত্রে কোনো ক্ষমতা নেই সরকারকে প্রতিনিধিত্ব করার। সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য না হওয়ায়, জাতীয় সংসদে প্রণীত কোনো আইনের দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত না হওয়ায় রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান সাপেক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়নি। কেবল জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে ক্ষমতা ও বৈধতা না থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চুক্তিতে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের' এর পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সই করায় তা অসাংবিধানিক। তা আইনসম্মত নয়, বৈধও নয়। ওদিকে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের' পক্ষে জনসংহতির শান্তিবাহিনীর কেবল একাংশের দেশদ্রোহী ভারতে-আশ্রিত নেতার তথা জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার চুক্তিতে সই করার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর, চাকমা বাদে আরও ১২টি উপজাতির ন্যায়ানুগ ও আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব করার অবকাশ তাকে কে দিল? পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জলার সংসদ সদস্য আছে, তিনটি জেলা পরিষদ আছে, বিভিন্ন সার্কেলের রাজারা আছে। তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে অস্ত্রের জোরে, ভারতে আশ্রিত সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদী অতি ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠী নেতা (০.২২ ভাগ চাকমার একাংশের নেতা) সন্তু লারমা কোন্ প্রতিনিধিত্বের জোরে অনির্বাচিত হয়েও এবং তার কোনো সাংবিধানিক ও আইনী স্বীকৃতি না থাকা সত্ত্বেও চুক্তিতে সরকারের বিপরীত পক্ষ হয়ে গেল? কোনো স্বীকৃত পন্থায় প্রতিনিধিত্ব নেই যে সন্তু লারমার সে ও তার সংগঠন কীভাবে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলির শর্ত মোতাবেক সরকারের সমতুল্য ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে? আসলে এক্ষেত্রে সংবিধান ও আইন লংঘিত হয়েছে। তাই সংবিধানের ১৪৫(২) অনুচ্ছেদের শেষ পংক্তি মোতাবেক এক্ষেত্রে "সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়ন কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না"।

শেষ কথা

প্রধানমন্ত্রী চুক্তি সই-এর পর পর মন্তব্য করেছিলেন সে, পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তির ফলে শান্তি আসবে এবং সেখানে আর কোনো গোলযোগ হবে না। এই আশাবাদ সত্য হয়নি। সারা দেশ চুক্তির সমালোচনায় মুখর। বিরোধী দলগুলি এবং সমাজের সকল শ্রেণী-পেশা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি স্বাক্ষরের চার ঘণ্টার মধ্যে সরকারী বন কর্মকর্তা অপহৃত হয়েছেন। আর আজ ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালের পত্রিকায়ও খবর বেরিয়েছে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা গিলাছড়ি ও কুতুবছড়ি বাজারে বাস আটকিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। মনে হচ্ছে এসব আরো চলবে জোরেশোরে। মাঝে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় বারংবার

www.pathagar.com

একদিন, দু'দিনব্যাপী হরতাল হয়েছে। তথায় অ-উপজাতীয়রা সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করেছে, কাফনের কাপড় পড়ে কালো পতাকা নিয়ে মিছিল করেছে। তিন জেলার সকল শহরে, গ্রামে। তারা কালো পতাকা টানিয়েছে। সড়ক অবরোধ চলছে দুই সপ্তাহ ধরে। তারা বাঙালী মন্ত্রীদের, সরকারী নেতাদের কালো পতাকা দেখিয়েছে, তাদেরকে বাঙালী গুচ্ছগ্রামে ঢুকতে দেয়নি। তাদেরকে প্রশ্ন করে জর্জরিত করেছে, তাদেরকে ধাওয়া করেছে। মন্ত্রীদের ঘেরাও করেছে তারা। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা মোতায়েন করতে হয়েছে। বিডিআর নেমেছে সর্বত্র। পুলিশ-বিডিআর গুলী চালিয়েছে। পুলিশ, সরকারী পেটোয়া গোষ্ঠীর সদস্যরা এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যরা নিদারুণ মারধোর, অত্যাচার, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ চালিয়েছে বাঙালী জনতার উপর। অন্যান্য ক্ষুদে উপজাতিও চাকমা একচ্ছত্র প্রাধ্যান্যের আশংকায় চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত। শান্তিবাহিনী প্রতিদিন অপহরণ করছে, লুটপাট করছে, অস্ত্র দিয়ে আঘাত করছে, খুনও করছে। চাঁদাবাজি পুরোদমে চলছে। মাটিরাঙায় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে, তার উস্কানিতে পুলিশের গুলীতে ৯ জন নিহত হয়েছে, ৫০ জন আহত হয়েছে, দেড় শতাধিক গ্রেফতার করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আন্দোলন ও হরতাল হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বত্র জনতার নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের বাড়ী-ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। চুক্তির পক্ষে গোয়েবলসীয় পদ্ধতিতে অসত্য প্রচার চলছে। টোপও দেওয়া হচ্ছে। মানিকছড়িতে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রচণ্ড লাঠিপেটা করেছে পুলিশ বাহিনী। এত খুন হয়েও, এতকিছু হারিয়েও, এত ত্রাসের মুখেও জনগণকে কালো পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে সরানো যায়নি। পার্বত্য তিন জেলা কার্যতঃ চুক্তি বিরোধী গণআন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছে। নিহতদের রক্ত ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে জনগণ।

পার্বত্যচুক্তি সংবিধান বিরোধী, দেশ বিরোধী, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী, গণতন্ত্র-মৌলিক অধিকার-সমতা-সমসুযোগ বিরোধী বলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে গেছে। চাকমা অত্যাচার ও চাকমা একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েমের ভয়ে ক্ষুদে উপজাতীয়রা এর বিরুদ্ধে গেছে। তাদের নেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকায় নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এর প্রমাণ রেখেছে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে গত দু'দশকেরও বেশি কাল ধরে চাকমা শান্তিবাহিনী, জনসংহতি ও এর অংগ সংগঠনসমূহ যে নারকীয় নির্যাতন, লুট, ধর্ষণ, খুন, অপহরণ চালিয়েছে, সেই তিক্ততম ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে বাঙালী মুসলমানরা বুঝতে পেরেছে চুক্তির পর চাকমা শান্তিবাহিনীর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলে তাদের ভাগ্যে কি আছে। একথা আরো স্পষ্ট হয়েছে ১৭ ডিসেম্বর বুধবার ১৯৯৭ বান্দরবান সার্কিট হাউসে। সেখানে পানিসম্পদ মন্ত্রী বলেছেন শান্তিচুক্তিতে যাই থাক পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী যারা আছে, তারা থাকবে। তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না। অন্যদিকে একই সভায় শাসক দল আওয়ামী লীগের

www.pathagar.com

স্থানীয় সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, আপনারা চলে যান। পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি বাঙালীও থাকবে না। তার এই কথায় হৈচৈ শুরু হলে তড়িঘড়ি করে সভা সমাপ্ত করা হয়। বাঙালীদের বিক্ষোভের মুখে পানি সম্পদমন্ত্রী তার সফরের সব কর্মসূচী সফল করতে পারেননি (দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭)। এটিই হচ্ছে উপজাতীয় নেতার মনের কথা এবং এই হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতি। এজন্যেই বাঙালীরা আশঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ এবং চুক্তি বাতিলে এত সোচ্চার। তারা এবং সমগ্র দেশবাসী শান্তি চায়। কিন্তু সংবিধান বিরোধী, প্রজাতন্ত্র বিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী পথে নয়। গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, সমতা, সমসুযোগ-এর অনুপস্থিতিতে নয়। সমঝোতা হোক, সমস্যার সমাধান হোক, শান্তি আসুক খোলা-মেলা পথে, সবাইকে নিয়ে, সবার প্রতি সম দৃষ্টি দিয়ে, বাংলাদেশের এক দশমাংশ ভূখণ্ড হাতছাড়া না করে। এজন্যে সম্পাদিত অবৈধ চুক্তিটি বাতিল করতে হবে। এ ব্যাপারে সাংবিধানিক, আইনগত, রাষ্ট্রপতির উদ্যোগগত, রাজনৈতিক ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

মোট কথা, চাপিয়ে দেওয়া ঐ দেশ-বিধ্বংসী চুক্তি মানুষ মেনে নেয়নি, নেবে না। এর জন্যে সংশ্লিষ্ট সবাই দায়ী থাকবে। বিরোধীরাও কার্যকর কিছু না করার দায় এড়াতে পারবেন না। সেন্টার ফর ডিমোক্রেটিক রাইটস্-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার এক হাজার মানুষের উপর পরিচালিত জরীপে দেখা গেছে শতকরা ৮২.৫ ভাগ অর্থাৎ ৮৩ ভাগ মানুষ পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে। তারা এ চুক্তিকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য এক হুমকিমূলক চুক্তি বলে মন্তব্য করেছেন। (দৈনিক ইনকিলাব, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭। দৈনিক দিনকাল, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭। দৈনিক দিনকাল, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৭, উপ-সম্পাদকীয় রেফারেন্স)।

চুক্তিতে মুক্তি না এসে দেশও ডুবে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কেউই পার পাবে না। চুক্তি করাটিই সাফল্যের ব্যাপার নয়। চুক্তি কোন্ শর্তে কীভাবে হলো, তাতে কি কি কল্যাণ এলো, সেসবই মূল বিচার্য বিষয়। সবাই শান্তি চান এবং সেজন্যেই সমঝোতা। অন্য কোনো কারণে নয়।

মনে রাখতে হবে একই দলের সরকার চুক্তি করে বেরুবাড়ী দিয়েও তিন বিঘা আদায় করতে পারেনি। আজও তিন বিঘা ভারতের করুণায়, দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতা জিম্মী। আবার এই দলেরই সরকার পানিচুক্তি করলেও ভারত থেকে পানি আসেনি। এবার শান্তিচুক্তি করলেই শান্তি এসে যাবে, তেমনটি ভাবার কোনো যৌক্তিক ও বাস্তব কারণ নেই।

পার্বত্য চুক্তি নিয়ে এই আগা-গোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণের শুরুতেই বলেছিলাম যে, এর প্রারম্ভিক অঘোষিত প্রস্তাবনাধর্মী বাক্যটির ব্যাখ্যা সবশেষে করবো। এখন সমগ্র চুক্তির প্রামাণ্য বিশ্লেষণের পর একথা স্পষ্ট যে, এই চুক্তির চারখণ্ড, ধারা এবং উপ-

www.pathagar.com

ধারাসমূহ নিজেদের চরিত্র, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গূঢ় তাৎপর্য চুক্তির সমগ্র অবয়ব দ্বারাই তুলে ধরেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য ধূলিস্মাৎ হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত করার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বাস্তব শর্ত ও সুযোগ এ চুক্তির মধ্যে নেই। এতে কেবল উপজাতীয়দের, আরো বিশেষ করে শান্তিবাহিনী ও চাকমাদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্য — এরকম ব্যবস্থা এই চুক্তিতে নেই। আর সর্বোপরি এই চুক্তি সংবিধান লঙ্ঘনকরতঃ বেআইনী পন্থায় সম্পাদিত হয়েছে। এসব কারণে চুক্তির প্রারম্ভিক বাক্যটি অসত্য ভাষণের নিষ্ঠুরতম দলিল হয়ে থাকবে।

রচনাকাল ০৫ থেকে ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
শেষ হলো বিকেল ১.৫৫ মিনিটে।

www.pathagar.com

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধকার, গবেষক, রাজনীতি বিশ্লেষক। গত ক'বছর ধরে ইসলামের উপর পড়াশোনা ও গবেষণা করছেন। ইসলাম বিষয়ক গবেষণাকর্ম প্রকাশ করা শুরু করেছেন। পত্র-পত্রিকা-সাময়িকীতে বহু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। শতাধিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার। আটাশটি গবেষণা গ্রন্থ এবং দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে গত দু'দশকে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ এ্যান আনসার্টেইন বিগীনিং : পার্সপেক্টিভস্ অন পার্লামেন্টারী ডিমোক্রেসী ইন বাংলাদেশ। এযাবৎ তার শেষ তিনটি বই ঃ সাপ্তাহিক ছুটি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি / পার্বত্য চট্টগ্রাম : ভূ-রাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব / পার্বত্য শান্তিচুক্তি : একটি আগা-গোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ।